কন্যাশিশু

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

কন্যাশিশু-১৯ - ২০২৪

কন্যাশিশু-১৯

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

সেপ্টেম্বর, ২০২৪

actionaid brac CONCERN worldwide SOS CHILDREN'S VILLAGES BANGLADESH The Hunger Project.

কন্যাশিশু-১৯
জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
আহসানা জামান এ্যানি

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৪

মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১ আরামবাগ, ঢাকা-১২০৭।

প্রকাশক
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল: ৪)
ব্লক: এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭ ।
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সভাপতি
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

সম্পাদকীয়

বিগত কয়েক দশকে আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা এখনও অনেক নাজুক, নারী-পুরুষের বৈষম্য আজও অনেক ব্যাপক, নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতনের চিত্র আজও ভয়াবহ।

আমাদের কন্যাশিশুদের একটি বড় অংশ এখনও পুষ্টি ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের অনেকেই শিশুবিবাহ ও পাচারের শিকার হচ্ছে। বিনোদন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও মুক্ত চলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় এখনও বহুলাংশে পিছিয়ে।

'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি- জুন) সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৫০ জন নারী। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ১৪ জন। এই সময়ে ৮৪ জন নারী স্বামী কর্তৃক হত্যা, ২৩৯ জন শিশু হত্যা, ১২ জন নারী যৌতুকের কারণে হত্যা এবং ১১৩ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

আমরা মনে করি, আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কন্যাশিশুদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার। এ লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. কন্যাশিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা; ২ শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার সকল ঘটনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ৩. উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে সর্বস্তরের জন্য 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা; ৪. কন্যাশিশুদের প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক থেকে তাদেরকে রক্ষা করা; ৫. কন্যাশিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা এবং শিশুবিবাহ প্রতিরোধ করা; ৬. শিশু সুরক্ষায় শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করা।

আমরা মনে করি, জাতির সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থেই নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা-বৈষম্য দূর হওয়া এবং শিক্ষা ও পুষ্টি-সহ তাদের প্রয়োজনীয় ও প্রাপ্য সব অধিকার

নিশ্চিত করা দরকার। আর সবার আগে দরকার সর্বস্তরে নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কারণ নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলে, সামাজিক লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর হলে সমাজ আপন গতিতেই বদলে যাবে, নারীরাও পাবে তাদের ন্যায্য অধিকার।

প্রসঙ্গত, কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'। ২০০০ সাল থেকে এ ফোরাম-এর উদ্যোগে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সচেতন মানুষ। এ বছরও 'কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয়ভাবে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এসব কর্মসূচি বা দিবস উদ্‌যাপন শুধু কোনো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নয়। বরং কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতন করা এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে কন্যাশিশুদের কল্যাণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আরও বেশি পরিমাণে কর্মসূচি গ্রহণ এবং অঙ্গীকার সৃষ্টিও এ দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিককরণের সামাজিক আন্দোলনকে বিস্তৃত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রকাশনা। এমন অনুধাবন থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশের ২৪ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'কন্যাশিশু-১৯' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রকাশনা। প্রকাশনায় স্থান পাওয়া প্রবন্ধসমূহে লেখকগণ নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি জাতির সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে তাঁরা বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পাচার-সহ বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার কারণ এবং এগুলো বন্ধের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করেছেন। উল্লেখ্য, পূর্বের ন্যায় এবারও নিবন্ধসমূহ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

সংকলনটির জন্য নিবন্ধ সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য ও কার্য-নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় যাঁরা তাদের মূল্যবান নিবন্ধ পাঠিয়ে সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

আমার বিশ্বাস, 'কন্যাশিশু-১৯' প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক লেখাগুলো কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও অর্থবহ ও বেগবান করবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সূচিপত্র

অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল হাছান	কন্যাশিশুর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা	০৭
অ্যাডভোকেট সালমা আলী	আজকের কন্যাই আগামীর ভবিষ্যৎ	১৬
আমিনুল ইসলাম সুজন	‘জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২’: জেন্ডার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ	১৯
উম্মে মুসলিমা	শিক্ষিত মা কি শুধু সন্তানই শিক্ষিত করবেন?	২৪
ওয়াহিদা বানু স্বপ্না	কন্যাশিশুরা প্রতিনিয়তই যৌন উৎপীড়নের শিকার	২৭
ড. আলেয়া পারভীন	এ কেমন ভরণপোষণ!	৩১
তানিয়া সুলতানা	বিকল্প পরিচর্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক কন্যাশিশুদের স্বপ্ন:	৩৫
তাহমিনা হক	কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন: জেন্ডার সমতা আনয়নে যুগোপযোগী কিছু ভাবনা	৩৮
বাবুল চন্দ্র সূত্রধর	শিশুর হাত ধরে মানবিকতাবোধ জাগ্রত হোক	৪৪
মাসুমা বিল্লাহ ও সেমন্তী মঞ্জরী	কিশোরী ও যুব নারীদের ডিজিটাল দক্ষতা ও স্বাধীনতা	৪৯
মাহফুজুর রহমান মানিক	শিক্ষায় কন্যাশিশুর এগিয়ে চলা ও বাল্যবিয়ের চ্যালেঞ্জ	৪৩
মিথুশিলাক মুরমু	চা বাগানের আদিবাসী কন্যাশিশু	৫৬
মো. মোসারফ হোসেন	কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য: স্বপ্ন ও চ্যালেঞ্জ	৬১
মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত	পারিবারিক সহিংসতা ও শিশুদের ওপর প্রভাব	৬৪
মৌসুমী শারমিন	সমাজের মনস্তত্ত্ব কন্যাশিশুর অগ্রযাত্রায় অন্তরায়	৬৬
রঞ্জনা বিশ্বাস	ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব	৭১
রহিমা আক্তার মৌ	কন্যারা হাসলে হাসে বিশ্ব	৭৮
রেভাঃ সত্যরাম ত্রিপুরা	পাহাড়ি কন্যাশিশুর জীবন সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনীর অন্তরালে	৮৩

শীপা হাফিজা	বাল্যবিবাহ নির্মূলেই সম্ভব বৈষম্যহীনতার প্রাথমিক ধাপ উত্তরণ	৮৯
সজীব সরকার	ইতিহাসের ভাষ্যে নারীর অনুপস্থিতি: কারণ ও প্রভাব	৯৫
সাবিরা নুপুর	কন্যাশিশু: বর্তমান পরিস্থিতি এবং করণীয়	১০০
সুব্রত ব্যানার্জ	বিশ্ববিদ্যালয় পরিমণ্ডল কেন যৌন হয়রানি ও	১০৩
সুতপা বেদজ্ঞ	নিপীড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে? নবযাত্রার পথে বাংলাদেশ, নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রশ্ন	১০৯
সৈয়দা অনন্যা রহমান	কন্যাশিশুর বঞ্চনা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন শিক্ষা ও আইনের প্রয়োগ	১১৩
ফারাহ কবির	কন্যাশিশুর অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন সমষ্টিগত উদ্যোগ	১১৭

অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল হাছান*

কন্যাশিশুর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতা গড়ে ওঠেছে নারী-পুরুষের যৌথ বিচরণ ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কারোর অবদান কোনো অংশে খাটো নজরে দেখার সুযোগ নেই। একটি সন্তান জন্মদানের আগে স্বামী বা স্ত্রী; কেউই জানেন না যে তাদের ঘরে কী সন্তানের আগমন ঘটছে; পুত্র নাকি কন্যা। অথচ সন্তান প্রাপ্তি প্রক্রিয়া ও প্রত্যাশায় উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। সন্তান পুত্র হবে কিংবা কন্যা হবে; এটির কোনো কিছুতেই তাদের একক কোনো কৃতিত্ব নেই। মানুষ চাইলেই সে নিজের ইচ্ছায় তার ঘরে পুত্র বা কন্যাসন্তান জন্ম দিতে পারে না। এটি সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়া'লার অপার অনুগ্রহ। তিনি মানবসভ্যতার কল্যাণে কাউকে দান করেন পুত্রসন্তান, কাউকে দান করেন কন্যাসন্তান, কাউকে দেন যৌথভাবে পুত্র ও কন্যাসন্তান উভয়ই (যমজ), আবার কাউকে রাখেন সম্পূর্ণ নিঃসন্তান। মুসলমান হিসেবে প্রতিটি দম্পতির প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার যে কোনো সিদ্ধান্ত সমর্পিত হৃদয়ে মেনে নেওয়া। মানবজাতির উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের সূরা শু'রা'র ৪৯-৫০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ এ বিষয়টি সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা।' পুত্র ও কন্যা উভয়ই আল্লাহর পাঠানো উপহার এবং এটি মানবসভ্যতা বিনির্মাণের জন্য একটি আশির্বাদ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমাজে কিছু মানুষ পুত্রসন্তান জন্মলাভ করলে খুব আনন্দ প্রকাশ করে। উৎসাহের সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় মানুষদের 'ছেলে হওয়ার' খবর জানায়। খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করে। খুব গুরুত্ব ও জাঁকজমকের সঙ্গে আকিকার আয়োজন করে। পক্ষান্তরে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সেই একই লোকই

*** অধ্যক্ষ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা, খণ্ডকালীন অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ স্মার্ট অ্যাডুকেশন নেটওয়ার্ক (বিডিসেন)**

কোনো খুশি প্রকাশ করে না। কারও সঙ্গে 'মেয়ে হওয়ার' কথা আলোচনা করতে চায় না। এমনকি কেউ জিজ্ঞাসা করলে নিচু আওয়াজে অসহায়ের মতো বলে, 'আমার মেয়ে হয়েছে।' অনেক সময় মেয়ে হওয়ার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কন্যাসন্তান হলে তালাকের ধমকির ঘটনাও শোনা যায়। কারও এক-দুটি কন্যাসন্তান হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে এ কথা বলে দিয়েছে, যদি এবারও তোমার মেয়ে হয়, তাহলে তোমাকে তালাক দিয়ে দেব। ভাবা যায়, এটি কত বড় জঘন্যতম ধৃষ্টতা এবং চরম বাড়াবাড়ি! কন্যাসন্তানের স্রষ্টাতো কোনো নারী নিজে নয়!

বস্তুত মানুষ সৃষ্টিতে মানুষের কোনো হাত নেই, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নির্দেশেই মানুষের জন্ম হয়, মৃত্যুও হয় তার নির্দেশেই। সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্তেই পুত্রসন্তান বা কন্যাসন্তানের জন্ম হয়! পৃথিবীর ইতিহাসে অজ্ঞতা ও বর্বতার এক যুগে কন্যসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হতো। সমাজে কারোর ঘরে কন্যাসন্তান আবির্ভূত হলে সে নারীকে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা হতো। এমনকি সে সমাজে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে মেরে ফেলা হতো। এ ছিল নিষ্ঠুরতার এক চরম সীমা। এমন বর্বরতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে বলেছেন, 'যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সেভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। ভেবে দেখো, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল!' (সূরা নাহল: আয়াত: ৫৮-৫৯)।

তবে আশা জাগানিয়া কথা হলো, যুগের নানা দৃশ্যপটে এবং কালের প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে এখন কন্যাসন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমাজের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল পর্যায় থেকেও কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে নারীর অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোনো দেশ ও জাতির উন্নয়ন তরান্বিত হয় না। নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সমাজ দ্রুত উন্নত হতে পারে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেই বিখ্যাত উক্তি– 'তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো' আজ যথাযথ যুক্তিযুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব এ উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই বর্তমানে কন্যাশিশুর শিক্ষার হারও বেড়েছে। বাংলাদেশেও কন্যাশিশুর শিক্ষার হার বেড়েছে। পূর্বে কন্যাশিশুর শিক্ষাগ্রহণকে অলাভজনকভাবে দেখা হতো। মেয়েদের লেখাপড়া করাতে খরচ হবে, বিয়ে দেওয়ারও খরচ আছে এসবের জন্য পূর্বে কন্যাশিশুর শিক্ষার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য কালক্রমে এ ধারণা পাল্টে যেতে শুরু করেছে। কারণ, আজকের

কন্যাশিশু আগামী দিনের নারী। তাই, প্রতিটি কন্যাশিশুর শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। কন্যাশিশুর শিক্ষা, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও দ্রুত সম্ভব হবে। যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। কন্যাশিশুরা হলো সর্বোত্তম বিনিয়োগ ও সমাজের আলোকবর্তিকা। কারণ, তাদের মধ্য থেকেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুঁজে পাই। কন্যাশিশুদের জন্য যদি ভালো বিনিয়োগ করা যায়, তবে সে-ই একদিন বড়ো হয়ে আদর্শ মায়ে পরিণত হয়। আর একজন মা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নানাভাবে আলোকিত করে তুলতে পারে। তাই, কন্যাশিশুর শিক্ষা, তাদের উপযুক্ত সম্মান ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদেরকে মানতে হবে, জন্মসূত্রে সব মানুষ স্বাধীন, উপযুক্ত অধিকার ও আত্মমর্যাদা লাভের অধিকারী। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার এই অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কন্যাশিশুটিকে কেন পদে পদে বৈষম্যের শিকার হতে হয়? মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই পরিবারের মুখে অন্ধকার নেমে আসে– হয়েছে একটি মেয়ে, যেন একটি বোঝা, একটি অভিশাপ! জন্মের আগেই কন্যাশিশুকে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যার ঘটনা সমাজে অহরহ ঘটে চলেছে। কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের পিতৃতান্ত্রিক হেয় দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করে অনেক আগেই হয়তো বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'বুক ঠুকিয়া বল কন্যা, বল ভগিনী, আমরা আসবাব নহি...আমরা মানুষ।' কন্যাশিশুর মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। জন্মের পর থেকে কন্যাশিশুর সামনে এগিয়ে চলার পথ কতটা কণ্টকাকীর্ণ তার ফিরিস্তি ব্যাপক। কন্যাশিশুরা জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে বঞ্চনার শিকার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কন্যাশিশুর শিক্ষার অধিকার তার ভাইটির চেয়েও অনেক কম।

খাবারের বেলায় ভালো খাবারটি, মাছের মুড়ো, মুরগির রান, দুধ-মাখন পুত্রশিশুর জন্যই বরাদ্দ থাকে। ফলে কন্যাশিশুটি অপুষ্টির শিকার হয়ে বাড়তে থাকে। যদিওবা শিক্ষার সুযোগ পায়, কৈশোর না পেরোতে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। বিয়ের পরে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাশিশুটি করে গর্ভধারণ, সেই সঙ্গে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা যৌতুকের জন্য নির্যাতন জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের কারণে পুতুল খেলার বয়সেই মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বা হতে হয় যৌতুকের বলি। এই কন্যাশিশুরা যদি সমস্বরে তীব্র কণ্ঠে সমাজ-সংসার কাঁপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে কেন আমাদের অকালে প্রাণ দিতে হলো? কী আমাদের অপরাধ? কোনো জবাব আছে কি?

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে।' সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা আছে– 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও স্বদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এছাড়াও সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে– 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।'

সংবিধানের আলোকে কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার কন্যাশিশুর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। কারণ, শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যাশিশুর সার্বিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) এবং 'প্ল্যান বাংলাদেশে'র এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। তাই, কন্যাশিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সরকার নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরফলে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান অন্তরায়। ছেলেসন্তান পরিবারকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করবে, বৃদ্ধ বয়সে বাবা মা'র দেখাশোনা করবে, এবং বংশ পরিচয় বাঁচিয়ে রাখবে। অন্যদিকে, মেয়েরা বিয়ের পর পরের বাড়ি চলে যাবে এবং তার সঙ্গে বাবা-মা'কে মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুকের বোঝা বহন করতে হবে। তাছাড়া, ধর্ষণ, ইভটিজিংসহ সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে বাবা-মা চিন্তামুক্ত হতে চান।

প্রযুক্তির মাধ্যমে ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া, পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অর্থোপার্জনের ঘটনাও ঘটছে। কন্যাশিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলোর ক্রমাগত ভয়াবহতার মাত্রা যে হারে বাড়ছে, তা একটি সুস্থ সমাজের চিত্র বহন করে না। একটি অসুস্থ, বিকৃত, দুর্নীতিপরায়ণ, অপরাধপ্রবণ সমাজ ও রাষ্ট্র যেন প্রতিদিন তার মসিলিপ্ত কদর্য চেহারা আমাদের সামনে উন্মোচিত করছে।

কন্যাশিশু নির্যাতনের আরেকটি অভিশাপ হলো বাল্যবিবাহের খড়্গ। একটি শিশুর যখন হেসে-খেলে আনন্দময় শৈশবে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানোর কথা, তখন তাকে বিয়ে

নামক খড়্গের নিচে মাথা পেতে দিতে হয়। নিতে হয় একটি সংসারের দায়িত্ব। অকালে গর্ভধারণ করে নিজে স্বাস্থ্যহীন হয়ে অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিয়ে এক স্বপ্নহীন দুর্বিষহ জীবনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে। সইতে হয় যৌতুকের নির্যাতন। স্বামীগৃহের নানা ধরনের অমানবিক আচরণ, অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা স্বামীগৃহ থেকে শিশুসন্তান কোলে কৈশোরেই কন্যাশিশুটি এক বিভীষিকাময় জীবনে নিপতিত হয়। কন্যাশিশুর সমাজের নানাবিধ অধিকারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা আজও সম্ভব হয়নি।

কন্যাশিশুর জীবন বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায়গুলো বিশ্লেষণ করলে একটি নির্মম সত্যই বের হয়ে আসে তা হলো– সমাজে তার অধস্তন অবস্থান। তার প্রতি পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট। এসবের পেছনে রয়েছে পুরুষতন্ত্র। সমাজ দ্বারা সৃষ্ট জেন্ডার ধারণার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। সন্তান জন্মের পর শিশুকে সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান তৈরি করা হয়। কন্যাশিশু যেন বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আত্মবিশ্বাসী মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারে তার জন্য সমাজে তার বিকশিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক দরজাগুলো খুলে দিতে হবে। একটি দেশের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে আলোকিত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কন্যাশিশুরা যখন সুস্থভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে পরিণত বয়সে পৌঁছায়, তখন তার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও প্রসারিত হয়ে যায়। আর এই কাজটি সম্ভব হতে পারে তখনই, যখন তাকে দেওয়া হবে লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, সহিংসতা-নির্যাতন-নিপীড়নমুক্ত নিরাপদ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ। প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, সমাজ-রাষ্ট্রের কাজে যথাযথ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কন্যাশিশু সমাজের বোঝা না হয়ে হতে পারে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কেন্দ্রিক শক্তি। সেই মহতী উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিশ্ব কন্যাশিশু দিবস পালন প্রতিটি কন্যাশিশুর জীবনে সার্থক ও অর্থবহ হয়ে উঠুক।

বাংলাদেশের দরিদ্র, অসহায়, অধিকারবঞ্চিত শিশু-কিশোরীদের নির্মমকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি ওদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যুর মুখে। প্রায়ই ওদের দেখা যায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে পরিচালিত মিছিলে, সড়ক অবরোধের কর্মকাণ্ডে। ওরা থাকে মিছিলের অগ্রভাগে, বহন করে প্ল্যাকার্ড ও মুখে থাকে স্লোগান শব্দ বুলেট। তাদেরকে যেন ব্যবহার করা হয় পুরুষদের ঢাল হিসেবে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার শিকারও হতে হয় ওদের অনেকক্ষেত্রে। বাংলাদেশে একের পর এক শিশুকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটছে। শিশু ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। গৃহকর্মী হিসেবে

নিয়োজিত শিশুদের ওপর চালানো হচ্ছে অমানসিক নির্যাতন। বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের মধ্যে একটি বিশাল অংশ হচ্ছে কন্যাশিশু। এরা গৃহস্থালি কাজে মাকে স্বাভাবিকক্রমেই সাহায্য-সহযোগিতা করে, যা অন্য পুত্রসন্তানরা করে না। কিন্তু কন্যাশিশুর এ ধরনের শ্রমের কোনো হিসাব করা হয় না। এর বাইরে দরিদ্র পরিবারের বেশিরভাগ কন্যাশিশুর অন্যত্র গৃহভৃত্যের কাজে লাগানো হয়। সেখানে দুবেলা দুমুঠো খাবারের বিনিময়ে দিন-রাত খেটে যেতে হয়। এছাড়া নির্যাতন-নিপীড়ন তো রয়েছেই। এমনকি বাড়ির পুরুষ সদস্যের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয় অনেক শিশুকে। অমানবিক এসব ধরনের অত্যাচার সহ্য করে পালানোর পথ না পেয়ে মেয়ে গৃহভৃত্যদের আত্মহত্যা করার ঘটনাও বিরল নয়। এসব ঘটনার জন্য দায়ী গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নজির কম। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারগুলো তাদের কন্যাশিশু সন্তানকেও যেকোনো ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, দেশে যতসংখ্যক নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, তার চেয়ে বেশি হয় কন্যাশিশু। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা নিজের বাড়ি– কোথাও কন্যাশিশু নিরাপদ থাকতে পারছে না। অসংখ্য মেয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছেই শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তথ্য বলছে, প্রতি বছর কন্যাশিশুরা যেভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, তাতে নারীরা চরমভাবে মানসিক ব্যাধি ও সামাজিক অবক্ষয় দিনদিন বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে আবার এখন যোগ হয়েছে পর্নোগ্রাফির মতো অসহনীয় যন্ত্রণা, যার প্রধান শিকার হচ্ছে আমাদের কন্যাশিশুরা।

সরকারের প্রণীত 'শিশু আইন', 'শিশুশ্রম নিরসন আইন', 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১', 'শিক্ষানীতি ২০১০', 'স্বাস্থ্যনীতি', 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭', 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮', ইত্যাদি কন্যাশিশুর শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও, সরকার বিনামূল্যে বই প্রদান, উপবৃত্তি, মিডডে মিল, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে '১০৯' হটলাইন সেবাও চালু করেছে। সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যকরী উদ্যোগে দেশে কন্যাশিশুর শিক্ষার হার এখন ক্রমবর্ধমান রয়েছে। সমাজ থেকে নারী-পুরুষের বৈষম্য, পুত্র-কন্যার মাঝে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ এবং কন্যাসন্তানদের প্রতি অবহেলা রোধ করতে পারলে আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নয়ন দ্রুত হবে এবং জাতি হিসেবে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস সারা বিশ্বে আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হয়। একটি মানবশিশু, যখনই দেখা গেছে লৈঙ্গিকভাবে সে কন্যাশিশু, তখনই আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজে

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কন্যাশিশুটি সম্পদ না হয়ে বোঝা হিসেবে প্রতিভাত হয়। মানবশিশু হয়ে যায় কন্যাশিশু; যার জের ধরে সারা জীবন তাকে অধস্তন হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে সমাজে অনুজ্জ্বল ও অপাঙক্তেয় হয়ে থাকতে হয়। নারীর অধস্তন অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্ব নারী আন্দোলন নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৯৫ সালে নারীর অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের জন্য ১২টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো কন্যাশিশুর অধিকার। এর আগে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু সনদ বলে একটি সনদ 'Convention on the Rights of the Child' গ্রহণ করে। এই বৈশ্বিক সনদ, বিশেষ কর্মসূচির ধারা-উপধারার সার নির্যাস হলো; কন্যাশিশুর জন্মের মুহূর্ত থেকে কৈশোর পার হয়ে জীবনচক্রের সব চক্র যখন অতিক্রম করবে, তখন যেন সে একজন পূর্ণ মানবসন্তান, পূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারে, নিজের জন্য উন্নত জীবন তৈরি করতে পারে। তার জীবনচক্রের বা পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার প্রতিটি পর্বে পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তাকে সব ধরনের আনুকূল্য প্রদান করবে। বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার সনদে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। সনদের ২নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ-ভাষা-শারীরিক বিশেষ অবস্থা– এসব কিছুর ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্র তার যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্ব নারী সম্মেলনেও কন্যাশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ সব ধরনের সহিংসতামুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

তবে আমরা বৈশ্বিক সনদ ও ধারা-উপধারার সকল কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে আজ অবধি শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করার কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, কিন্তু সমাজে কন্যাশিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো আমরা কতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছি– এটি ভাবনার বিষয়। উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু সঠিক মাত্রায় কতটুকু হচ্ছে, সেটি নিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের নিরাপত্তার দিকটি যদি বিবেচনায় নেওয়া যায়, আমরা দেখতে পাই, ঘরে-বাইরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যানবাহনে কন্যাশিশুরা ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অনবরত। ধর্ষণের পর খুন, আত্মহত্যা, অ্যাসিডদগ্ধ হয়ে জ্বলেপুড়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক। একটি নারী সংগঠনের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার পেপার ক্লিপিংয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, কন্যাশিশু নির্যাতনের বহুমাত্রিক বর্বরতা ও ভয়াবহতায় শূন্য থেকে ১৮ বছরের শিশুরা সমাজে কতটা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে তার খতিয়ান। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্যাশিশুদের কেউ ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অগ্নিদগ্ধ, অ্যাসিডদগ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়তই। যৌতুকের বলি, আত্মহত্যা, খুন, বাল্যবিবাহ, পুলিশি নির্যাতন, তাদের জীবনে নিপীড়নের ভয়াবহ থাবা কত নির্মম, নিষ্ঠুর এবং বর্বরতম, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাইবার ক্রাইম। কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা

প্রতিরোধে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইনি পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও কন্যাশিশুর প্রতি ধর্ষণের মাত্রা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ। এরই মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যরোধে ২০০০ সালে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। দুটি দিবস পালনের উদ্দেশ্য অভিন্ন। শিশু শিশুই হোক, সে কন্যা বা পুত্র। তাদের সবার জন্য নিরাপদ, বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তোলাই এসব দিন পালনের গোড়ার কথা। তবে কন্যাশিশুদের জন্য আলাদা একটি দিবস পালনের মূলে রয়েছে দেশের প্রচলিত সামাজিক অসচেতনতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবজনিত কারণে ছেলেশিশুদের তুলনায় কন্যাশিশুরা বেশি মাত্রায় বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। সর্বশেষ আদমশুমারির তথ্যমতে, বর্তমান বাংলাদেশে বছরে শূন্য থেকে ১৭ বয়স বয়সী ২ কোটি ৯১ লাখ ৮১ হাজার কন্যাশিশু রয়েছে। সরকারি তথ্যে জানা যায়, দেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু যাদের মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু। আইসিসিডিডিআরবি ও প্ল্যান বাংলাদেশ পরিচালিত জরিপ অনুসারে, এসএসসি ও এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে অপরিণত বয়সে অর্থাৎ ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীর বেলায় এই হার ৮৬ শতাংশ। অপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হলেও ১৫, ১৬ বা ১৭ বছরের মেয়েদের বিয়ে হওয়াকে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ে পড়ানো কাজীদের ওপর অর্পিত দায়িত্বও তারা যথাযথভাবে পালন করেন না। বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের মধ্যে ১৩ লাখ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দারিদ্র্যের চাপে অনেক কন্যাশিশু এসব কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের শিল্প-কারখানাসহ ছোট ছোট কারখানার নানা ধরনের শ্রমের কাজ করানো হয় ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের দিয়ে। এক তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে শতকরা ৯৪ ভাগ শিশুশ্রমিক কৃষি এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। প্রায় ৪৭ লাখ শিশুশ্রমিকের মধ্যে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা বেশি। এদের মধ্যে রয়েছে কন্যাশিশুও। শিশুর কাজের প্রতিকূল পরিবেশ তাদের শারীরিক, মানসিক বৈকল্য এনে দেয়, যা ধীরে ধীরে জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যই মূলত শিশুশ্রমের জন্য দায়ী। সম্পদের অপ্রতুলতা ও অসম বণ্টন, সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব বাড়িয়ে চলছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা। বেকারত্ব বাসা বাঁধছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক সুস্থ বিকাশের ধারা। শিশুশ্রম একদিকে যেমন শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টি করছে নানা সামাজিক সমস্যার।

সর্বোপরি, বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানের বাংলাদেশ এখন অনেক দিক থেকে উন্নত হলেও কন্যাশিশুদেরকে একটু আলাদা নজরে দেখার প্রবণতা থেকে আমরা আজও

পুরাপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি, আমাদেরকে এ বিষয়ে অনেক সচেতন হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিশুকে আমাদের শিশু হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে; সেটি পুত্র, নাকি কন্যা– এব্যাপারে পৃথকীকরণের কোনো চিন্তাই আমাদের মাথায় রাখা যাবে না। এতে বৈষম্য বাড়ে, বাড়ে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়। আইন করে, বৈশ্বিক সনদ করে বা অধ্যাদেশ জারি করে কন্যাশিশুদের সম্মান বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা, তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি, নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের সমাজে কন্যাশিশুর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের প্রকৃত অধিকার সংরক্ষিত হবে। মনে রাখতে হবে, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর; সেটি হোক পুত্র বা কন্যাশিশু। আজ যারা শিশু, কাল তারাই বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। আজ যারা বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, একদিন তারাও শিশু ছিলেন। তাই আসুন, শিশুদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে বা পুত্র-কন্যার পার্থক্য নির্ণয় না করে তাদেরকে সমানভাবে আগামীর সমাজ বিনির্মাণের প্রধান কারিগর হিসেবে দক্ষ করে তুলি।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী*

আজকের কন্যাই আগামীর ভবিষ্যৎ

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রতি বছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস এবং ২০১২ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে ১১ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালিত হয়। কন্যাশিশু দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে নারীর অধিকারের পাশাপাশি শৈশবে কন্যাশিশুর শিক্ষা, পুষ্টি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি কন্যাশিশুদের শিক্ষার অধিকার, পুষ্টি, আইনি সহায়তা, ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা– এই বিষয়গুলোতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাও কন্যাশিশু দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যাশিশু। এই কন্যাশিশুরাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা বিকাশের সুযোগ পেলে নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সভায় নেতৃত্বদানে পারদর্শী হয়ে ওঠবে। তাই কন্যাশিশুদের প্রতি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে তাদের জন্য একটি সমতার বিশ্ব গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ন্যায্য ও সাম্যের পৃথিবী গঠন সময়ের দাবি।

আমাদের দেশে কন্যাশিশুরা এখনও নানাভাবে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। তাই কন্যাশিশুদের পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত-সহ তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের সুদক্ষ কারিগর/নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কন্যাশিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

শুধু যে আমাদের দেশে কন্যাশিশুরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সারা বিশ্বে কোনো না কোনো স্থানে তারা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, নিজ পরিবার ও সমাজে তারা নিগৃহীত হচ্ছে। তাদের প্রতি সহিংসতা ও নৃশংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

*** সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি**

আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত পাচার-সহ বিভিন্ন সহিংসতা ও ধর্ষণের মুখোমুখি হচ্ছে কিশোরীরা। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে আইনের মাধ্যমে দোষীদের বিচার নিশ্চিত করা না গেলে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে সামাজিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কন্যাশিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা বন্ধের জন্য সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কন্যাশিশুর অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পাশাপাশি পুরুষদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

অনেক পরিবার কন্যাসন্তান জন্ম নিলে ভালোভাবে নেয় না। কন্যাসন্তান হলে তাদের বিয়ে দিতে হলে অনেক টাকা খরচ হবে– এই ভেবে তাদের বাল্যবিয়ে দিয়ে দেয়। কারণ তারা কন্যাসন্তানকে বোঝা মনে করে এবং কন্যাশিশুদের সমস্যার দিকটি বিবেচনায় নেয় না। ফলে কন্যাশিশুরা পরিবারের মানুষদের কাছেও নিরাপদ নয়। তাই নারী ও কন্যাশিশুদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রত্যেকেরই সচেতন ভূমিকা পালন করা উচিত।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসকে সামনে রেখে কন্যাশিশুদের কল্যাণে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে পুত্রসন্তানের পাশাপাশি কন্যাসন্তানকেও সমান গুরুত্ব সহকারে নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। আগামীর উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে– এই লক্ষ্য নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

আমাদের কন্যাশিশুরা নানানভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হন তা বোঝার জন্য আমি নিচে একটি কেস স্টাডি তুলে ধরছি।

কেস স্টাডি

জামিলা (ছদ্মনাম) দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। পরিবারে অভাব থাকায় কিশোরী অবস্থায় (১৩/১৪) বছর বয়সে তাকে পরিবার থেকে বিয়ে দেওয়া হয়। অভাবের সংসারে বিভিন্ন সময়ে ঝগড়া হত এবং তার স্বামী তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং গার্মেন্টসে কাজ দেয়। গর্ভবস্থায় জামিলা অসুস্থ হলে পড়লে তাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই সে বাবার বাড়িতে অবস্থান করা শুরু করে। কয়েকমাস পর তার ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম দিলে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেটা পছন্দ করে না। জামিলা ও তার শিশুকন্যাকে তারা সংসারে ফিরিয়ে নেয় না, জামিলাকে তার বাবার বাড়িতে রেখে চলে যায়।

মেয়ের বয়স যখন দেড় বছর, তখন জামিলার স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। মেয়েকে তার মায়ের কাছে রেখে জামিলা ঢাকায় চলে আসে এবং এক গার্মেন্টস

কারখানায় পুনরায় কাজ নেয়। সেখানে সহকর্মীর এক পরিচিত ভাইয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তারা ভারতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৬ সালে জামিলা ও তার সঙ্গে আরও কয়েকজন মেয়েকে ভারতে নিয়ে বিক্রি করে দেয় এক চক্র। সেখানে জামিলার ওপর সেই পরিচিত ব্যক্তি-সহ আরও কয়েকজনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। জামিলা পরবর্তীতে পালাতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে আটক করে স্টেট আফটার কেয়ার হোম 'নারী নিকেতন মহিলা আশ্রমে' পাঠিয়ে দেয়। জামিলা আশ্রমে থাকার সময় বিভিন্ন বিষয়ে হাতের তৈরি নকথীকাঁথা, হ্যান্ডমেইড জুয়েলারি, হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রায় আট বছর সেই হোমে থাকে জামিলা। অবশেষে 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি' ও 'দিল্লী স্টপ' ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় সে ৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে দেশে ফিরে আসে। ফিরে আসার পর বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সেফ হোমে অবস্থান করে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির শেল্টার হোমে কিছুদিন অবস্থান করার পর পরিবারের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়।

বহুদিন পরিবার ও দেশ ছেড়ে অন্য অপরিচিত দেশে থাকার ফলে জামিলাকে অনেক মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে। তার ছোট শিশুসন্তানকে ছেড়ে থাকার জন্য দীর্ঘ কয়েকটি বছর অসহ্য মানসিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। দেশে ফিরে আসার পরও সামাজিকভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরিবারকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তবে দেশে ফিরে আসার পর জামিলাকে পরিবারে হস্তান্তরের পর প্রথমে সে নিজে স্বল্প পরিসরে হস্তশিল্পের কাজ এবং পরে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য একটি ছোট দর্জির দোকান পরিচালনা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে তার মানসিক দৃঢ়তা ও কাজের প্রতি একাগ্রতা তার জীবনের মোড় পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

আমিনুল ইসলাম সুজন*

‘জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২’: জেন্ডার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান উপস্থাপনের প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সংস্থাটি নানাবিধ শুমারি, জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য হালনাগাদ করে। এ সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেশের জনসংখ্যা গণনা, যা প্রতি দশ বছর পর পর দেশব্যাপী পরিচালিত হয়। বিবিএস ২০২২ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে ডিজিটাল ডিভাইসের (ট্যাব) মাধ্যমে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২’ পরিচালনা করে। জুলাই ২০২২-এ প্রাথমিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে এবং নভেম্বর, ২০২৩-এ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেশের মোট জনসংখ্যা, খানা সংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় তথ্য পাওয়া যায়, যা লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর বর্তমান অবস্থার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

জনশুমারি-২০২২ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৪৯.৫১% বা ৮,১৭,১২,৮২৪ জন, নারী ৫০.৪৩% বা ৮,৩৩,৪৭,২০৬ জন এবং হিজড়া ০.০১% বা ১২,৬২৯ জন। বর্তমানে দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সামান্য বেশি এবং এ প্রবণতা ঢাকা বিভাগ ব্যতিত দেশের অন্য সব বিভাগেই লক্ষ করা যায়। যেহেতু নারীর সংখ্যা বেশি, তাই নারীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-দক্ষতাসহ বিভিন্নরকম উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, গত দু’বছরে আনুপাতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ডওমিটার্স [Worldometers.info] এর ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭,৩৯,৭৬,০০০ জন।

এছাড়া, দেশে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২% এবং এতে দেখা যায়, পুরুষের

* ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, সদস্য, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও কোষাধ্যক্ষ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন

(১.১২%) তুলনায় নারী (১.৩১%) জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির তুলনামূলক হার বেশি। তবে, গ্রামের (০.২১%) তুলনায় শহরে (৩.৯০%) উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান এবং সব বিভাগেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শহরে কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি– এটি নিয়ে গবেষণা করা দরকার। বরিশাল বিভাগের গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেতিবাচক, এটাও জানা দরকার। প্রজননস্বাস্থ্য, যা প্রধানত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– বিশেষভাবে দৃষ্টিতে দিতে হবে।

জনশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা বেশি হলেও পরিবারের প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে নারী অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৪,০২,৫৭,০৩৭ টি পরিবার রয়েছে, যার মধ্যে ৮২.১০% বা ৩,৩০,৫১,৭৬২টি পরিবারে পুরুষ প্রধান এবং মাত্র ১৭.৯০% বা ৭২,০৫,২৭৫টি পরিবারে নারী প্রধান। শহর ও গ্রামে নারী প্রধান পরিবারের হারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তবে বিভাগভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায়, নারীপ্রধান পরিবার জাতীয় গড়ের চাইতে রংপুর (১২.৯৪%), খুলনা (১৩.১৫%), রাজশাহী (১৩.৮৫%), ময়মনসিংহ (১৬.৬৯%) ও ঢাকা (১৭.৬৫%) বিভাগে কম, বরিশাল বিভাগে জাতীয় গড়ের সমান, সিলেট বিভাগে (১৯.৪৭%) সামান্য বেশি এবং চট্টগ্রাম বিভাগে উল্লেখযোগ্য হারে (২৭.১২%) বেশি।

পুরুষ প্রধান পরিবারে শিশু ও নারীর প্রতি বিনিয়োগ তুলনামূলক কম হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কন্যাশিশুর চাইতে ছেলেশিশুর চাহিদা গুরুত্ব পায়। এর প্রধাণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বাবা-মাকে বৃদ্ধ বয়সে ছেলেশিশু দেখভাল করবে। তাই, ছেলের জন্য ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে, কন্যাশিশু বিয়ে হয়ে অন্য পরিবারে চলে যাবে। তাই তার প্রতি বেশি ব্যয়কে খরচ বা অপব্যয় হিসেবে দেখা হয়, বিনিয়োগ হিসেবে নয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শিশু বয়স থেকেই কন্যাশিশুরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে এ সমস্যা প্রকট।

লক্ষ করা যায়, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারে কন্যাশিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বেশি। কন্যাশিশুরা বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। কারণ, স্কুল থেকে ফিরে ছেলেশিশু খেলাধুলা করার সুযোগ পেলেও কন্যাশিশু মাকে গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করে বা করতে হয়। গৃহস্থালি কাজে যুক্ত করা কন্যাশিশুর জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণও, কারণ বড় হয়ে বিয়ের অন্যের পরিবারে সে যেন রান্নাসহ গৃহস্থালি কাজ করতে পারে। যেন স্বামীগৃহে 'বাবা-মা কিছুই শেখায়নি অপবাদ সইতে না হয়'।

যেসব দরিদ্র পরিবারে মা-কে বাইরে কাজ করতে হয় সেসব পরিবারে বাধ্যতামূলকভাবে কন্যাশিশুদের গৃহস্থালি কাজ সামলাতে হয়। আর যে পরিবারে কন্যাশিশু থাকে না, সে পরিবারের বাইরে কাজ শেষে এসে গৃহস্থালি কাজ নারীকেই করতে হয়। সমাজে

গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়। এ বিষয়ে গবেষণা কাজে যুক্ত থাকার কারণে জানার সুযোগ হয়েছে, গৃহস্থালি কাজে নারীদের ভূমিকা মুখ্য হলেও এসব কাজ পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যায়ন হয় না।

জাতীয় পর্যায়ে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭ বছর ও তদূর্ধ্বদের মধ্যে ৭৪.৮০% [শহরে ৮১.৪৫% ও গ্রামে ৭১.৬৮%] এবং দেশে পুরুষ (৭৬.৭১%) ও নারী (৭২.৯%)। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্বদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৭০.১৯% [শহরে ৭৮.৬৯% ও গ্রামে ৬৬.১৬%] এবং পুরুষ ৭২.৬৩% ও নারী ৬৭.৮৯%]। দুটি পর্যায়েই স্বাক্ষরতার হারে একটি দৃশ্যমান বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে গ্রামে স্বাক্ষরতার হার কম, যেখানে নারীর বসবাস বেশি। লিঙ্গভিত্তিক স্বাক্ষরতার হারেও দেখা যায়, নারী পিছিয়ে রয়েছে। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পরও স্বাক্ষরতার হার শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সবারই আয়-ব্যয় বুঝতে পারা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র পড়ার দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। এতে করে পরিবার ও সমাজে প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি কমে আসবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় দৃশ্যমান। সেটা হলো, কারিগরি শিক্ষায় পুরুষের (৭৩.৫৭%) তুলনায় নারী (২৬.৪৩%) খুবই পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমান সময়ে আয়মূলক কাজের জন্য কারিগরি শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। এজন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর প্রভাব কর্মসংস্থানে লক্ষ করা যায়। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪২.২% কাজে যুক্ত থাকলেও পুরুষের (৭২.৭৫%) তুলনায় নারীরা (১২.৮৮%) খুবই পিছিয়ে রয়েছে এবং শহর [পুরুষ ৭৩.৫৫% ও নারী ১৫.৫২%] ও গ্রাম [পুরুষ ৭২.৩৪% ও নারী ১১.৬৯%] – উভয় স্থানেই নারী কর্মসংস্থানে অনেক পিছিয়ে। তবে গৃহস্থালি কাজে পুরুষের (৫.১৩%) অনেক বেশি নারী (৯৪.১৬%) যুক্ত। এছাড়া জনশুমারিতে দেখা যায়, ১৫ হতে ২৪ বছর বয়সীদের লেখাপড়া, কাজ ও প্রশিক্ষণে যুক্ত থাকার মতো সামর্থ্যবান ৩৪.২৬% মানুষ কোনো কিছুতেই যুক্ত নন। এক্ষেত্রে পুরুষের (১৩.২৮%) তুলনায় নারী (৫৬.৪৩%) অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রথমত, দেশের সকলকেই বয়স অনুযায়ী লেখাপড়া, কাজ ও প্রশিক্ষণে যুক্ত করার পরিকল্পনা থাকা জরুরি, যা দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মানুষের ব্যক্তিগত আয় বাড়বে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু নারী এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, তাই নারীদের এসব ক্ষেত্রে যুক্ত করার বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা দেখতে পাই, জাতীয় পর্যায়ে পুরুষের বিয়ের গড় বয়স ২৫.২৮ বছর এবং নারীদের বিয়ের গড় বয়স ১৯.২৯ বছর। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারীর গড় বয়স ছয় বছর কম। আপাতদৃষ্টিতে এটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু, জনশুমারি প্রতিবেদনের একটু গভীরে গেলে সমস্যা পরিলক্ষিত হবে। যেহেতু মোট জনসংখ্যার বড়

অংশ গ্রামে থাকে, গ্রামে ও শহরে দরিদ্র মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

জনশুমারিতে ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৫.০৮% [পুরুষ ৬৭.৭৬% ও নারী ৬৭.৩২%] বিবাহিত এবং ২৮.৬২% অবিবাহিত [পুরুষ ৩৫.৮৬% ও নারী ২২.০৪%]। সার্বিক ৫.৩১% বিবাহিত জনগোষ্ঠীর স্বামী/স্ত্রী মারা গেছেন– তন্মধ্যে 'স্ত্রী মারা গেছেন এমন স্বামীর (১%)' চাইতে 'স্বামী মারা গেছেন এমন নারী (৯.৫০%)' সংখ্যা অনেক বেশি। বিয়ে বিচ্ছেহের (তালাক) হার ০.৪২% খুবই কম হলেও নারীর (০.৬২%) সংখ্যা পুরুষের (০.২০%) তিনগুণ বেশি। এছাড়া, বিয়ের পর বিচ্ছেদবিহীন আলাদা থাকার হারও ০.৩৭% খুবই কম, তবে এক্ষেত্রেও নারীর (০.৫১%) সংখ্যা পুরুষের (০.২২%) দ্বিগুণেরও বেশি। বিয়েসংক্রান্ত তথ্যাবলিতে শহর ও গ্রামে খুব বেশি পার্থক্য নেই। উল্লেখ্য, এ জনশুমারিতে একাধিক বিয়ে/তালাকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

এখানে যে তথ্যটি ভয়াবহ, অল্পবয়সীদের বিয়ে, তালাক ও স্বামী/স্ত্রী মারা যাওয়ার তথ্য ওঠে এসেছে। যেমন: ১০ থেকে ১৪ বছর: ১.৬৬% বিবাহিত, তন্মধ্যে ছেলেশিশু ০.৯৬% এবং কন্যাশিশু ২.৪২% বিবাহিত এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর: ২১.২৪% বিবাহিত, তন্মধ্যে ছেলেশিশু ৪.৪২% এবং কন্যাশিশু ৩৭.২১% বিবাহিত। এতে দেখা যায়, বিয়ের গড় বয়স ১৯.২৯ বছর হলেও এ বয়সের আগেই ৩৭% এর বেশি নারীর বিয়ে হয়ে যায়। অর্থাৎ, দেশে কন্যাশিশুরা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে এবং সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে আইন করেছে সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র ১৯,৯১০ বর্গকিলোমিটার শহরে দেশের ৩১.৫১% বা ৫,২০,০৯,০৭২ জন এবং ১,২৭,৬৬০ বর্গ কিলোমিটার গ্রামে ৬৮.৪৯% বা ১১,৩০,৬৩,৫৮৭ জন বসবাস করেন। শহরে মানুষ কম হলেও আয়তন বিবেচনায় নিলে শহরে ঘনবসতি অনেক বেশি। এখানে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় নারী বেশি গ্রামে থাকেন। দরিদ্র পরিবারে অনেক পুরুষ সদস্য কর্মসংস্থানের কারণে শহরে বসবাস করেন। গ্রামে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়ানো হলে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে আসবে।

জনশুমারি অনুযায়ী দেশের ১.৩৭% বা ২২,৬৫,২০১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১২,৮৬,৭৯১ জন ও নারীর সংখ্যা ৯,৭৭,৮৬৯ জন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক (৩৩.৩৮%) সবচাইতে বেশি। এরপর রয়েছে দৃষ্টি (১১.৯৫%), মানসিক (১০%), বাক্ (৯%), বুদ্ধি (৬.১৫%), শ্রবণ (৫.২৯%), অটিজম (৩.৯৪%) প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এছাড়া একাধিক প্রতিবন্ধকতা (১২.০৪%)

উল্লেখযোগ্য। দেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবকাঠামো (ফুটপাথ, সড়ক ও পরিবহন, ভবন) সহায়ক প্রবেশগম্যতা না থাকায় বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সেবা প্রদানকারী অনেক ভবনে তাদের প্রবেশ করার জন্য 'র‍্যাম', 'এলিভেটর' ইত্যাদি নেই। এক স্থান হতে আরেক স্থানে যাতায়াত একটি বড় সমস্যা। পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করার সুবিধা নেই বললেই চলে। এসব সমস্যা ক্রমশ দূর করা হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও বেশি উৎপাদনমুখী কাজে যুক্ত করা সম্ভব।

বর্তমানে ১৫-বছর ও তদূর্ধ্বদের প্রায় ৭০% মোবাইল ও ৩৭% ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। মোবাইল [পুরুষের ৮৪.১৬% ও নারী ৫৬.৬৩%] এবং ইন্টারনেট [পুরুষ ৪৬.৫৮% ও নারী ২৭.৭৭%] ব্যবহারের তথ্যে দেখা যায়, দুটি ক্ষেত্রেই নারী বেশ পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্য, কর্মসংস্থান, লেখাপড়া ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আধুনিক যোগাযোগ খুবই জরুরি। এজন্য পর্যায়ক্রমে এগুলো ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে, যেন মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো নারী হয়রানির শিকার না হন। প্রায়শই, এ প্রযুক্তি ব্যবহারে গোপন ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে বিভিন্ন অনৈতিক সুবিধা আদায়ের ঘটনা জানা যায়। এসব চিরতরে বন্ধ করা প্রয়োজন। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে ক্ষতির শিকার হলেও নারীর প্রতি এর প্রভাব বেশি পড়ে।

যে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংক হিসাব জরুরি। শুমারিতে দেখা যায়, ১৫-বছর ও তদূর্ধ্বদের প্রায় ২৫.৩৫% [পুরুষ ৩১% ও নারী প্রায় ২০%] এর ব্যাংক হিসাব এবং ৩৯.১১% [পুরুষ ৫২.৩৩% ও নারী ২৬.৫৭%] এর মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। আবার গ্রামের চাইতে শহরে– উভয় লিঙ্গের মানুষের ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের হার বেশি। আর্থিক স্বাধীনতা যে কোনো মানুষের মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

দেশের ৭৫% এর বেশি পরিবার কাঠ, লাকড়ি, খড়ি, লতাপাতা রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে, যা গৃহস্থালি বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। যেহেতু গ্রামীণ সমাজে নারীরা রান্নার কাজ করে, তাই তাদের বায়ুদূষণের হওয়ার হার বেশি। এতে কন্যাশিশু ও নারীদের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত, শহরে ১৪.১৮% পরিবারে তিতাস গ্যাস (লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত) এবং শহর ও গ্রামে ১০.১৩% পরিবারে এলপি গ্যাস (সিলিন্ডার) ব্যবহার করে। এছাড়া, ১% এর কম পরিবার বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদি রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে।

উম্মে মুসলিমা*

শিক্ষিত মা কি শুধু সন্তানই শিক্ষিত করবেন?

নারীশিক্ষা, নারীর অগ্রগতি, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির কথা ওঠলেই অনিবার্যভাবেই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বিখ্যাত উক্তি চলে আসে। 'শিক্ষিত মা শিক্ষিত জাতির জন্ম দিতে পারে'– বোনাপার্টের এ মহান বাণী শুধু আমরাই না, আমাদের বাপ-দাদারাও শুনে এসেছেন তাঁর বাণী প্রদানের পর থেকেই। নারীশিক্ষার প্রণোদনায় বা উদ্বুদ্ধকরণে বাণীটির কার্যকারিতা একসময় যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল বলা যেতে পারে। অনেক বাবা এ বাণী বুকে ধারণ করে 'পাছে লোকে কিছু বলে' মনোভাব নিয়েও কন্যাশিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। কেননা তাদের ওসব কন্যাশিশুই একদিন শিক্ষিত মা হবে। দু/এক যুগ আগেও শিক্ষিত মায়েদের নিকট বাণীটি যে অর্থে গ্রহণযোগ্য ছিল আজকের দিনে কেবল তাতেই আর তারা সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। তারা ভাবছেন শুধু ঘরে বসে জাতিকে শিক্ষিত সন্তান উপহার দেওয়ার জন্যই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাদের এরও বাড়তি কিছু কাজ রয়েছে।

এ আলোচনায় বসলে আবারো প্রশ্ন ওঠে মা তার যেসব সন্তানকে শিক্ষিত করবেন সে সন্তানরা কি পুত্রসন্তান কন্যাসন্তান উভয়ই, না কেবল পুত্রসন্তান? মহাবীর নেপোলিয়ান কি রাষ্ট্রক্ষমতায় নারী শাসন, শাসনবিভাগের উচ্চপর্যায়ে কর্মজীবী/চাকরিজীবী নারী বা সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের কথাটি ভেবেও ঐ উক্তি করেছিলেন? তা-ই যদি হবে, তাহলে কেবল সন্তান লালন-পালন করে শিক্ষিত করে মানুষ করবেন কারা? শিক্ষিত নারীরা যদি ঘরের বাইরে কাজ করার জন্য আবদার করেন, তাহলে সন্তান শিক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব কে বহন করবে? তার মানে সোজা কথা উনি বলতে চেয়েছেন বীর পুরুষেরা দেশ/জাতি উদ্ধারে ঘরের বাইরে ব্যস্ত থাকবেন, আর তাদের বিদূষী ভার্যারা দেশোদ্ধারে তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের শিক্ষিত করে তৈরি করে দেবেন। দেশোদ্ধার করবে কারা? না, বীর পুরুষেরা। তাহলে মোদ্দাকথা দাঁড়াচ্ছে শিক্ষিত মা চাওয়ার পেছনে একটাই কারণ– পুত্রসন্তানরা যাতে শিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠে। পাশাপাশি

*** কথাসাহিত্যিক**

মেয়েদেরও ততটাই শিক্ষিত করে বড়ো করা উচিত যতটা শিক্ষা পেলে তিনি একটি আলো জাতি (পুরুষশাসিত) উপহার দিতে পারেন।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষিত বলতে কতটা শিক্ষিত বোঝায়? স্কুল পাস? কলেজ পাস? ইউনির্ভাসিটি পাস? অধিক উচ্চতর ডিগ্রি লাভ? নাকি রবীন্দ্রনাথের মতো স্কুল-কলেজের সীমানা অতিক্রম না করেও বিপুল বিদ্যার অধিকারী হওয়া? তবে বাস্তবে যা দেখা যায় তা হচ্ছে একজন মা সে যত বিদ্যাধারীই হোক না কেন তার সন্তানকে শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত তিনি শিক্ষাদান করতে পারেন। কেননা তিনি যে বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন তার সন্তানের সেই একই বিষয়ে লেখাপড়া না করাই স্বাভাবিক। তারপরেও মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনের পর অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য আর মায়ের কোলের মধ্যে পড়ে থাকতে পারে না। তারা ঘরের আঙিনা ছেড়ে বড়ো শহরে বা বিদেশে পাড়ি দেয়। তাহলে কি সেই শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে যে শিক্ষা পুঁথিগত নয়, কিন্তু সন্তানকে শুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একজন মায়ের শিক্ষিত থাকা অপরিহার্য? কিন্তু আমাদের দেশের প্রস্তাবিত-বিয়ে-সংস্কৃতিতে কনে পছন্দের বিচারে সেই স্ব-শিক্ষা যাচাই করা কি সোজা? তাহলে ডিগ্রিধারীকেই শিক্ষিত বলতে আমরা বাধ্য।

দু মতাদর্শের দু'পক্ষের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডায় একটি বিষয় এসে পড়া খুব স্বাভাবিক। একপক্ষ বলতে পারে সন্তান ভালোভাবে মানুষ করার জন্য মায়েদের উচ্চশিক্ষিত হওয়ার চেয়ে কেবল গৃহবধূ হওয়া জরুরি। আরেকপক্ষ যুক্তি দেখাতে পারে যদি কেবলই গৃহবধূ হয়ে থাকতে হয়, তাহলে উচ্চশিক্ষার কোনো দরকার নেই। সন্তানকে তার নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য যেটুকু বিদ্যার প্রয়োজন সেটুকু জানা থাকলেই যথেষ্ট।

একটি পরিবার যখন তাদের ছেলে-মেয়ে দু'জনকেই একই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে, তখন ঐ পরিবার কি এই প্রত্যাশা মনে মনে লালন করে যে মেয়েটি কেবলই একটি শিক্ষিত মা হবে, আর ছেলেটি দেশের কর্ণধারদের একজন? যে মেয়েটি ভাইয়ের পাশাপাশি সমপর্যায়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠছে সে হয়ত কোনো রোমান্টিক মুহূর্তে ভাবলেও ভাবতে পারে যে সে একজন শিক্ষিত মা, সুনিপুণ গৃহিণী, প্রেমময়ী স্ত্রী হয়ে ওঠতে যাচ্ছে অচিরেই। তবে বাস্তব জীবনে পা দিয়ে ঐ শিক্ষিত মেয়েটি স্বনির্ভরতার মূল্য হাড়ে হাড়ে টের পায়। আর যে অভিভাবক একই খরচ, একই প্রত্যাশা, একই ঝুঁকি (মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি) নিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে সমান শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর তারা কি তাদের মেয়েটিকে কেবল একজন নির্যাতিতা গৃহবধূ হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখেন?

আবার একজন শিক্ষিত গৃহবধূ-মা যখন তার নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে তার উচ্চশিক্ষা লাভ কেবলই সময় আর অর্থের অপচয় বৈ আর কিছুই নয়, তখন

তিনি কি তার কন্যাসন্তানটিকে উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবেন? কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও রন্ধননিপুণতাকেই যখন একজন বউ-এর গুণের একমাত্র স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচনা করেন শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা। তাছাড়া ঐ শিক্ষিত মা নিজে উপলব্ধি করেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে মেয়েরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তার স্বাধীন ইচ্ছের প্রতিষ্ঠা চাইলেই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখনই শুরু হয় সম্পর্কের অবনতি, বিচ্ছিন্নতা। যেহেতু স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়স্বজনরা তাকে বাইরে চাকরি করতে দেবেন না, সেহেতু কেবল আত্মোন্নয়ন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করার জন্য সেই 'ঘর পোড়া গরু' মায়েরা কেনইবা তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করার অপরিণামদর্শিতা প্রদর্শন করবেন? তারচেয়ে ভালো অক্ষরজ্ঞান দান করার পর মেয়েকে স্কুল-কলেজে না পাঠিয়ে কেবল বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাতেও যদি সংসারের আবিলতা থেকে নিজকে একটু আড়াল করে অন্তত নিজের সমৃদ্ধ মনোজগতে একাকি মেয়েটি বিচরণ করতে পারে। কিন্তু ডিগ্রিধারী না হলে মেয়ের জন্য ভালো জামাই-বা মায়েরা কোথায় পাবেন? আবার অন্যদিকে মায়েরা যে নিজেদের অকালমৃত স্বপ্নগুলোকে তাদের মেয়েদের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে চান। ছেলেরা তো প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যই জন্মায়।

আজ সারা বিশ্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তিকে কেবল শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য ঘরের মধ্যে পুরে রাখলে তার কতটুকু সম্ভব হবে তা বলাই বাহুল্য। মা-বাবা দু'জনকেই অর্থোপার্জনে ঘরের বাইরে সময় দিতে হলে সন্তান মানুষ করার দায়িত্বও দু'জনের উপরেই সমানভাবে এসে পড়ে। এরও একটা উপকারী দিক হলো এতে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই একটা বৈষম্যবর্জিত পরিবেশে মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং নিজেদেরকেও সেভাবেই গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়। তাছাড়া উন্নত জীবনযাপনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সচ্ছল থাকার সহজাত বাসনা, আধুনিক জীবন উপভোগের অপরিহার্য অনুষঙ্গে নিজকে শামিল করার জন্য সংসারে একজনের আয় আজ আর যথেষ্ট নয়। উপরন্তু শিক্ষিত সন্তান জাতিকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার বাজারে শিক্ষাদানের বিপুল ব্যয়ভার শিক্ষিত গৃহবধূ-মায়ের আর্থিক অংশগ্রহণ ব্যতীত একা পিতার পক্ষে বহন করা যে কেবল আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া শিক্ষা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আত্মপরিচয়ে বড়ো হওয়ার দীক্ষা দেয়। তাই বীরোত্তম নেপোলিয়ান থাকুক মাথার উপর – শিক্ষিত মা-বাবা উভয়েরই যৌথ আর্থিক ও মানসিক সাহচর্যে জাতি পাক একটি সম্পূর্ণ, সমন্বিত, সুশিক্ষিত ও বিবেকবোধসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিকসমাজ।

ওয়াহিদা বানু স্বপ্না*

কন্যাশিশুরা প্রতিনিয়তই যৌন উৎপীড়নের শিকার

আজ থেকে ২৫ বছর আগে তখন বর্তমান সময়ের মতো পথশিশুদের বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বিষয়গুলো এভাবে গণমাধ্যমে আসতো না। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শিশুরা বিশেষ করে কন্যাশিশুরা যারা যেকোনোভাবে রাস্তায় এসেছে বা রাস্তায় বসবাস করছে, তারা অনেকবার ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া খারাপ ধরনের স্পর্শ, যৌন নির্যাতন, যৌন উৎপীড়ন তো প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত পথশিশুদের জীবনে হচ্ছেই। অন্যদিকে একটি বিরাট চক্র (নারী গ্রুপ) তারা বস্তিবাসীদের শিশুদের – যারা গ্রাম থেকে শহরে (ভালো কাজের আশায়) আসে – চুরি করে কিংবা শিশুদের কিনে নিয়ে অসামাজিক কাজে নিয়োজিত করার আগে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা এসব শিশুকে অভিভাবকের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজে নিয়োগ করে।

সাধারণত আমরা বলি আমাদের দেশে বন্ডেড লেবার নেই। কারণ এ বিষয়টি আমরা চোখে দেখি না। কিন্তু বেশ বড় বড় চক্র রয়েছে সেখানে শিশুরা বন্ডেড লেবারের মত বাসাবাড়িতে অথবা যৌনকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে, আরেকটি বড় চক্র রয়েছে যারা শিশুদের যৌনকর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন পতিতালয়ের মায়েদের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক যৌনকাজে নিয়োজিত করে। এই শিশুদের বেতন বা মাসের জন্য নির্ধারিত টাকা ঐ চক্রের নারীর হাতে চলে যায় এবং সেই নারীদের বা খালাদের অ্যাপ্রোচ/পন্থা এমন থাকে যে তারা শিশুদেরকে বলে রাখে 'তোমার যখন টাকা লাগবে, তখন আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে'। এভাবে শিশুরা ভাবতে থাকে তাদের অনেক টাকা– বড় অঙ্কের টাকা জমে যাচ্ছে এবং এই টাকার জন্যও শিশুরা ঐ নারীদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। মিথ্যা বিশ্বাস আর আশা নিজেদের বুকের মাঝে ধরে রাখে, আর সুদিনের অপেক্ষায় নারীদের কাছে থেকে যায়।

*** প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ, কবি, কথাসাহিত্যিক ও গবেষক**

পথশিশুর ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের পেছনে দারিদ্র্যের চেয়েও বড় যে কারণটি কাজ করে সেটা হচ্ছে পরিবারে এ শিশুরা কোনো গুরুত্ব, মর্যাদা, আদর বা ভালোবাসা পায় না, বরং এক ধরনের অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়ে এক পর্যায়ে তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এ শিশুরা বাবা-মায়ের জন্য কখনো কাঁদে না, কারণ পরিবারের সঙ্গে তাদের তেমন কোনো গাঢ় সম্পর্কের বন্ধন বা জায়গা তৈরি হয় না। আরেকটি কারণ বহুবিবাহ; বহুবিবাহ আমাদের সমাজে কমেনি, বরং বেড়েছে। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবা কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। এভাবে নারীপ্রধান ও সিঙ্গেল মাদার পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। শিশুদের আদর, ভালোবাসা, গুরুত্ব, মর্যাদা পাবার কোনো পারিবারিক পরিবেশ না পাওয়ায় শিশুরা ঘর ছেড়ে পথে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছি, কিন্তু বিয়ে নিবন্ধনের ব্যবস্থা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারিনি। আর তা না হলে তো বহুবিবাহ বন্ধ হবে না। সৎ মা-বাবার মারধর, অবজ্ঞা, অবহেলা ও নির্যাতনের কারণেও শিশুদের একটি বড় অংশ পরিবারের চাপে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে অথবা জীবন-জীবিকার তাগিদে পথে ঠিকানাবিহীন, মা-বাবা বিহীন দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এই পথশিশুরা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং মায়ের সঙ্গে, বাবার সঙ্গে, অন্যদের সম্পর্ক ও বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আচরণ তাদেরকে বাধ্য করে বাড়ি ছেড়ে গৃহকর্ম, যৌনকর্মসহ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত হতে।

অন্যদিকে পারিবারিক সহিংসতা, কলহ বিবাদ, বাবা প্রতিনিয়ত মা ও ছেলে-মেয়েদেরকে মারধোর করে, নেশা করে, সংসার চালাতে পারে না, সে কারণেও অনেক শিশু বন্ধুদের হাত ধরে পালিয়ে আসে শহরে। আবার ভালো কাজের খোঁজে অনেক পরিবার গ্রাম থেকে শহরে আসছে। যেসব শিশুদের বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে, সেখানে দেখা যায় শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অভাবে শিশুগুলো ঘর হারিয়ে ফেলে, পথ হারিয়ে যেয়ে পথেই বসবাস করে অথবা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ধরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেক শিশু হারিয়ে যায়, পালিয়ে যায়, পাচার হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যবসায়িক কারণে বিক্রি হয়ে যায়। আরেকটি কারণ যেটি আমরা কখনো চিন্তা করি না সেটা হচ্ছে বিনা পয়সায় যাতায়াতের সুযোগ। আমরা পালিয়ে আসা যতজন শিশুর সাক্ষাৎকার নিয়েছি, সেখানে দেখেছি শিশুরা ট্রেনে, ট্রেনের ছাদে, লঞ্চে, ফেরিতে, ইস্টিমারে, বাসের ছাদে বিনা টিকিটে শহরে চলে আসছে। কারণ এখানে শিশুরা কার কাছে যাবে, কোথায় যাবে তা অনুসন্ধান করার আমাদের কোনো চেকিং বা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই।

পথশিশুদের নিয়ে কাজ করতে যেয়ে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয় আমাদের। প্রথমত, আমরা সহজেই কোনো বাসা ভাড়া পাই না, কষ্ট করে যদিওবা

একটা বাসা পাওয়া যায় তার ভাড়া দিতে হয় দ্বিগুণেরও বেশি। দ্বিতীয়ত, যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি হয় তা হচ্ছে স্থানীয় কমিউনিটিকে আমাদের কাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোঝানো। অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ সবসময়ই থেকে যাচ্ছে। আমরা বারবার বলে যাচ্ছি যে সরকারের সঙ্গে এনজিওদের কাজের সমন্বয় করা প্রয়োজন, যা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পথশিশুদের উন্নয়নে সোশ্যাল ম্যাপিং করে কে কোথায় কাজ করছে এবং আরও কোথায় কাজ করা প্রয়োজন তা এতদিনেও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এই যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে এ কার্যক্রমগুলোর পরিমাপের কোনো সূচক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস একদমই নেই, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বলতে কোনোকিছুই কাজ করছে না।

আবার অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কত কত টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে শিশুদের জন্য বিন্দুমাত্র কোনো কিছু করছে না। আবার এক্ষেত্রে আমাদের সরকারের নীতিমালার অভাবও রয়েছে, একটি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পলিসি করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমরা শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করেছি, সে অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা করা হয়েছে, বাস্তবায়ন করতে আমাদের কার কী দায়িত্ব হবে সেটিও নির্ধারণ করা আছে। এজন্য খাতওয়ারি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ টাকা ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার কোনো সুযোগ নেই।

অন্যদিকে, আমাদের দেশের চারদিকে খোলামেলা সীমান্ত থাকার কারণে শিশুরা পাচার হয়ে যাচ্ছে, অস্ত্র আসছে, ড্রাগ আসছে এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সিন্ডিকেটেরা টাকা খাচ্ছে, মাঝখান দিয়ে আমরা আমাদের একটি প্রজন্মকে একদম ড্রেনে ঠেলে দিচ্ছি। তারা মেধাশূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তি আমরা শেষ করে দিচ্ছি এবং তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দিচ্ছি। শিশুসংক্রান্ত বিষয়গুলো কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। পথশিশুদের মাদক খাইয়ে অভ্যস্ত করে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাদক বিক্রি, পাচার, বহন-সহ সকল ধরনের কাজে এবং একইসঙ্গে চুরি, ছিনতাই থেকে হত্যা পর্যন্ত সকল প্রকার অপরাধে এসব শিশুরা ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিশুদের সুরক্ষায় এখনই আমাদের একটি সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, শুধু কমিটি করে ছেড়ে দিলে হবে না। আমি মনে করি, যতদিন দেশের মানুষ না জাগবে, নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই যতদিন পর্যন্ত না নেবে, ততদিন শুধু দাতা সংস্থার টাকায় আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। আমাদেরকে কমিউনিটি বেইজড অ্যাপ্রোচে যেতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক, কমিউনিটি স্কুল, কমিউনিটিভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক রিপোর্টিং ও মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। সেখানে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিরা রয়েছেন, তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে ও জবাবদিহি

হতে হবে। আমাদের সংবিধানেই বলা আছে যতদিন স্থানীয় সরকার শক্তিশালী না হবে, ততদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। আমাদের পথশিশুরা পুলিশের কাছে, শিক্ষকের কাছে, স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে। যতদিন এ প্রজন্মকে আমরা দেশের নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে, দক্ষ মানুষ হিসেবে, উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের সম্পদে পরিণত করতে পারব না, ততদিন আমরা সার্বিকভাবে জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতেও পারব না। আমরা চাই, রাষ্ট্র এসব শিশুদের জীবন পরিবর্তনের দায়িত্ব নিবে, শিশুদের প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকবে এবং সে অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ড. আলেয়া পারভীন*

এ কেমন ভরণপোষণ!

"Man is born free and everywhere he is in chains"— Jean Jacques Rousseau.

মানুষ হিসেবে নারীর জীবনে উপরোক্ত উক্তিটি যে কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করলেও এক সময় সে পরাধীন হয়ে যায়। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র আপাতদৃষ্টিতে নারীকে বিভিন্ন বিধি-বিধানের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রদান করলেও তা আসলে নারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলেই আবদ্ধ করে। সমাজের কাছে নারী মানেই দুর্বল, অবলা, অপরের ওপর নির্ভরশীল এক ধরনের প্রাণী যে কিনা সর্বদা পুরুষের ওপর নির্ভর করে জীবন-ধারণ করে থাকে। পরিবার ও সমাজে পুরুষের ওপর নির্ভর করে থাকার জন্য তৈরিও হয় বিভিন্ন বিধি বা আইন। আজ আমরা পারিবারিক আইনের এমনই এক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব যার নাম ভরণপোষণ। ভরণপোষণ নামক এ বিধি দ্বারা নারী তথা স্ত্রীকে সমাজে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। কাজেই ভরণপোষণ কী সে সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত।

ভরণপোষণ হচ্ছে– স্ত্রীর খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং তার ব্যক্তিগত যাবতীয় খরচের অধিকার। বিবাহিত একজন স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত অধিকার হচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ লাভের অধিকার। স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর প্রথম ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

মুসলিম আইনে বিয়ে চুক্তির ফল হলো ভরণপোষণ। আইনে স্ত্রীর ভরণপোষণে স্বামীকে বাধ্য করা হয়েছে। স্ত্রী আইনগত কারণে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করেও ভরণপোষণ পেতে পারেন। অর্থাৎ স্বামী যদি নিষ্ঠুর আচরণ করেন, প্রাপ্য তাৎক্ষণিক দেনমোহর স্ত্রী চাইলে, স্বামী তা দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী আলাদা বসবাস করেও ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। মোটকথা যতদিন পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন। এভাবে নারীকে

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা

ভরণপোষণের নামে পুরুষের ওপর নির্ভর করে রাখা হয়েছে। নারীর নির্ভরশীলতা টিকিয়ে রাখার জন্যই হোক কিংবা মুসলিম পারিবারিক আইনে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনের জন্যই হোক স্বামীরা কি প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন? কিছু বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি তুলে ধরছি:

ঘটনা-১: দরিদ্র কৃষি পরিবারের সন্তান সুন্দরী রাবেয়ার সঙ্গে এক লাখ টাকা দেনমোহরে বিয়ে হয় একই গ্রামের কৃষি পরিবারের সন্তান শাহীনের সঙ্গে বছর দু-এক আগে। শাহীন কারখানায় কাজ করলেও নিয়মিত মজুরি পান না। রাবেয়া দর্জির কাজ জানেন এবং বিয়ের সময় তার বাবা তাকে একটি সেলাই মেশিন এবং মেয়েজামাইকে ঘড়ি-সাইকেল উপহার দেন। কিন্তু অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়ি, ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে, সংসার সামলে দর্জির কাজ তেমন করে ওঠতে পারেন না রাবেয়া। ফলে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। ব্যবসা করে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য শাহীন প্রায়ই রাবেয়াকে তার বাবার নিকট থেকে দু লাখ টাকা আনার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু রাবেয়ার বাবার পক্ষে দু লাখ টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে প্রায়ই শাহীন রাবেয়াকে মারধর করেন আর বলেন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো শাহীনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সন্তানকে রেখে রাবেয়াকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেন শাহীন দু লাখ টাকা আনার জন্য। টাকা আনতে পারলে রাবেয়ার সংসার থাকবে, নতুবা নয়। হায়রে ভরণপোষণের নমুনা!

ঘটনা-২: নগদ তিন লাখ টাকা যৌতুকের বিনিময়ে রূপার বিয়ে হয় কাপড় ব্যবসায়ী ফরিদের সঙ্গে। রূপা-ফরিদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম বছর ভালই চলছিল। ব্যবসাকে বড় করার জন্য পুঁজি দরকার। তাই রূপার কাছে তিন লাখ টাকা চাইলে রূপা তার পিতার কাছ থেকে দু লাখ টাকা এনে দেন। রূপা-ফরিদের দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় বছর এভাবেই কেটে যায়। দ্বিতীয় বছরে রূপা-ফরিদের সংসারে নতুন অতিথির আগমন ঘটে। তৃতীয় বছরের শেষদিকে হঠাৎ করে অগ্নিকাণ্ডে দোকান পুড়ে যাওয়ায় ব্যবসায় বড় রকমের ক্ষতি হয় ফরিদের। ফলে ব্যবসাকে পুনরায় দাঁড় করানোর জন্য আরও পাঁচ লাখ টাকা পিতার কাছ থেকে এনে দিতে বলেন রূপাকে। কিন্তু রূপার পিতা নানা কারণে এবার অপারগতা প্রকাশ করলে রূপাকে সন্তানসহ শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেন ফরিদ এবং বলে দেন যতদিন পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে না পারবেন, ততদিন স্বামীর বাড়িতে ফিরতে পারবেন না রূপা। আর কোনো খরচও দিবেন না ফরিদ। ফলে রূপার পিতা বাধ্য হয়ে, মেয়ের সংসার বাঁচাতে মেয়ে-জামাইকে ধার-দেনা করে তিন লাখ টাকা দেন। আর বাকি টাকা ছয় মাসের মধ্যে দিবেন বলে ওয়াদা করেন। ফলে স্বামীর সংসারে ফিরে আসার সুযোগ পান রাবেয়া। কিন্তু বাকি টাকা নির্ধারিত সময়ে দিতে না পারায় পুনরায় রূপাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেন ফরিদ। ইতোমধ্যে হঠাৎ করে পিতা মারা গেলে নানা কারণে রূপা আর টাকা যোগাড় করতে

পারেননি এবং তার সংসারেও ফিরে যাওয়া হয়নি। ওদিকে বহুবিবাহের সুযোগ থাকায় রূপাকে একতরফা তালাক দিয়ে নগদ পাঁচ লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন ফরিদ। কাজেই রূপার মনে প্রশ্ন জাগে এ কেমন ধরনের ভরণপোষণ যে যৌতুক যতদিন দিতে পারবেন ততদিন সংসার থাকবে, নতুবা নয়? এতো নিজের টাকায় নিজেরই ভরণপোষণ!

ঘটনা-৩: শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মেধার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় চাকরিজীবী শহীদের সঙ্গে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে। সংসারে তেমন কোনো ঝামেলা নেই। মেধা-শহীদ দম্পত্তির দু সন্তান। তবে সন্তান দুটি প্রায়ই অসুস্থ থাকে। এজন্য তাদের প্রায়ই চিকিৎসার পেছনে অর্থ ব্যয় বেড়ে যায়। চিকিৎসা ব্যয় এবং সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মেধা কিছুটা সঞ্চয় করে। শখের বশে শহীদও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে চাকরির পাশাপাশি মনোহারির ব্যবসা শুরু করে বছর দশেক আগেই। কিন্তু ব্যবসা করলেও তেমন লাভ করতে পারে না শহীদ। বরং ঘাটতি থেকেই যায়। আর ঘাটতি হলেই সংসারের টাকা ব্যবসায় কাজে লাগায়। ফলে সংসারে অশান্তি ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাব দেখা যায়। তার ধারণা বেশি বেশি বিনিয়োগ মানে বেশি বেশি লাভ। ব্যবসার ক্ষেত্রে কথাটি সত্য হলেও শহীদের ব্যবসার ধরন অনুযায়ী কথাটি পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। তবে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে শহীদের যে পরিমাণে আগ্রহ, সংসারের ব্যয়ে সে পরিমাণেই অনাগ্রহ। শহীদ সর্বদা চায় মেধা যেন তার সব টাকা সংসারের পেছনে ব্যয় করেন এবং মেধার হাতে যেন কোনো টাকা না থাকে। এমনকি সঞ্চয়ের টাকাও। বিশেষ প্রয়োজন মনে করলে তা শহীদ দিবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে সবসময় মেধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান শহীদ, যা মেধার ভাল লাগে না। পিতার এ আচরণ সন্তানদেরও অপছন্দ। মেধা যে কোনো বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন, যা তিনি তার পরিবার হতে শিখেছেন এবং বিয়ের প্রথম পাঁচ-সাত বছর উভয়ে এভাবেই সংসারে পরিচালনা ও ব্যয় করে আসছেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ব্যবসায় লাভ না হওয়ায় শহীদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে সংসারে তার টাকা খরচের কারণেই তিনি ব্যবসায় লাভ বা সঞ্চয় করতে পারছেন না। কারণ তার একার এত টাকা লাগে না। কাজেই স্ত্রী তার সম্পূর্ণ টাকা সংসারে ব্যয় করবেন এবং তার নিজের চাকরির টাকা তিনি ব্যবসার কাজে লাগাবেন। এজন্য যে উপায়ে হোক স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। স্বামী শহীদের স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কারণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনাকালে শহীদ জানান চাকরিজীবী স্ত্রীকে বিয়ে করেছে তাকে সংসারে অর্থ ব্যয় করার জন্য। তা না হলে তো তিনি গৃহিণীই বিয়ে করতেন। শহীদ আরও জানান তাদের দেশে নাকি স্ত্রীর ভরণপোষণ কেউ করেন না, স্বামীর ভরণপোষণ করাই নাকি স্ত্রীর দায়িত্ব। সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য স্ত্রীরাই নাকি স্বামী তথা সংসারে স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য থাকেন। স্বামীর এ ধরনের কথা শুনে মেধার মুসলিম পারিবারিক আইনের ভরণপোষণের বিষয়টিকেই নিষ্প্রয়োজন মনে হলো।

উপর্যুক্ত বর্ণিত ঘটনা তিনটি হলেও বিষয় এক। আর তা হলো ভরণপোষণ সংক্রান্ত। ভরণপোষণের অধিকারের নামে নারীকে পুরুষের ওপর যুগের পর যুগ নির্ভরশীল করে রাখা হলেও বর্তমান বাস্তবতা হলো নারী নয় বরং পুরুষই তার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। যৌতুকের টাকা, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া কিংবা স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ দিয়েই প্রকারান্তরে সংসার পরিচালনা করা এ এক চরম বাস্তবতা। পূর্বে আমাদের দেশে আইনানুযায়ী স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ভরণপোষরণর দায়িত্ব পালন করলেও নানা কারণে এখন দায়িত্ব পালনে এক ধরনের অনীহা বা ইচ্ছার অভাব দেখা যায়। "মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারীর অধিকার: বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর সচেতনতা অধ্যয়ন" নামক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২৭ জন নারীর মধ্যে কেবল ৩৬২ জন (৬৮.৭%) নারী বলেছেন সঠিকভাবে তাদের স্বামীরা সঠিকভাবে তাদের ভরণপোষণ করে থাকেন। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণের এ হার ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। কারণ পুরুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে স্ত্রীর ভরণপোষণ। বাস্তবে গভীর আলোচনা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে স্বামীদের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব ও মন-মানসিকতার কারণে নারীরা সর্বদা পরিপূর্ণভাবে ভরণপোষণের অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হন না।

বর্ণিত ঘটনা তিনটি আমাদের সমাজজীবনেরই প্রতিচ্ছবি। নারীর ভরণপোষণ করাকে যেখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতে নারীকেই ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য করা হচ্ছে বা এরূপ মনোভাব একশ্রেণির পুরুষের মধ্যে ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে কি মুসলিম পারিবারিক আইনে ভরণপোষণের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে না? পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য যে নিয়ম-নীতি তথা পারিবারিক আইন তৈরি করা হয়েছিল সময়ের প্রেক্ষাপটে কি তা এর অকার্যকারিতার পথ তৈরি করছে না? কারণ সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া এ ধরনের ঘটনা আইনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। ফলে ভেঙে পড়ছে পারিবারিক কাঠামো। বৃদ্ধি পাচ্ছে তালাক ও বহুবিবাহের ঘটনা।

এক সময় ছিল নারীরা আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা পেশায় সম্পৃক্ত হয়ে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। একজন স্বাবলম্বী নারীর কাছে একজন পুরুষ বা স্বামী সহযোগী বন্ধু হলেও নির্ভরশীল নারীর কাছে একজন পুরুষ বা স্বামী আজও অন্নদাতারূপেই আর্বিভূত হন। কাজেই সময় এসেছে ভরণপোষণ নামক আইনকে নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার। এজন্য বিবেচনায় নিতে হবে বর্তমান নারীদের আয়মূলক কর্মকাণ্ডসহ নারী-পুরুষের সমমর্যাদাকে।

তানিয়া সুলতানা*

বিকল্প পরিচর্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক কন্যাশিশুদের স্বপ্ন

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। একটি বৈষম্যহীন এবং সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে শিশুদের সুস্থ ও নিরাপদে বেড়ে ওঠার বিকল্প নেই। লিঙ্গবৈষম্য আমাদের সমাজে প্রকটভাবে আঁকড়েছিল দীর্ঘকাল, যার পরিব্যাপ্তি এখনো সর্বস্তরে বিস্তৃত। ফলে ছেলেশিশুদের তুলনায় কন্যাশিশুরা সুযোগ-সুবিধায় নানাভাবে পিছিয়ে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিশুদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার মাধ্যমেই কেবল দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি সম্ভব। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলার পাশাপাশি এক অপার সম্ভাবনাময়ী শক্তি হতে পারে কন্যাশিশুরা।

কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসনে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। এ বছর কন্যাশিশু দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে– 'কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশে শিশুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নানাবিধ কারণে যেমন, দরিদ্রতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনার শিকার, পিতা-মাতার মৃত্যু, গৃহহীন এবং ভাসমান পরিবারে জন্মের ফলে সঠিকভাবে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক তথ্যমতে, বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা প্রায় চৌত্রিশ লাখ, যার উল্লেখযোগ্য অংশই কন্যাশিশু। ঝুঁকির মাপকাঠির সূচকে কন্যাশিশুদের অবস্থা অত্যধিক শোচনীয়, যাদের জন্য প্রয়োজন বিকল্প পরিচর্যার সুব্যবস্থা। বিকল্প পরিচর্যা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ একদিকে যেমন শিশু আইন তৈরি করেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদকে অনুসমর্থন দিয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুদের বিকল্প পরিচর্যার কাঠামোতে বাংলাদেশ কতটুকু সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে এবং আরও কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এসব বিষয় বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট অনুসমর্থন

* অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর (স্পনসরশিপ), এসওএস শিশু পল্লী

করেছিল। শিশু অধিকার সনদের পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সনদে বর্ণিত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বাধ্য। সনদের ২নং ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি শিশু ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে বেড়ে ওঠবে এবং তা নিশ্চিত করতে পক্ষরাষ্ট্রসমুহ অঙ্গীকারবদ্ধ। একইসঙ্গে ধারা ৩ এ শিশুর অধিকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালত খুরশিদ জাহান লিজা বনাম বাংলাদেশ মামলায় শিশুর স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে দিতে বলেছে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ২০নং ধারার আলোকে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য কারণে বঞ্চিত শিশুদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রের এই দায়িত্বকে বিকল্প পরিচর্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে নতুনভাবে শিশু আইন প্রণয়ন করে এবং উক্ত আইনের দশম অধ্যায়ে বিকল্প পরিচর্যার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে শিশু অধিকার সনদে ছেলে কিংবা মেয়েশিশুদের সমানভাবে অধিকার চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধাবঞ্চিত শিশু বলতে আইনের ৮৯ ধারায় বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ হয়েছে, যার কোনো একটির ফলে একজন শিশুর বিকল্প পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।

কন্যাশিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যার প্রয়োজন হয়ে থাকে যে সকল কারণে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবকহীন হয়ে পড়া, যৌন নির্যাতনের শিকার, যৌনবৃত্তিতে আসক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা, অসৎ সঙ্গ, নৈতিক অবক্ষয় বা অপরাধে সম্পৃক্ত হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকা, বস্তিতে কিংবা গৃহহীন হয়ে রাস্তায় বসবাস করে, ভিক্ষাবৃত্তি বা অপকর্মে লিপ্ত। অত্র ধারায় উল্লেখিত অবস্থাগুলোর কন্যাশিশুদের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক এবং প্রায়োগিক।

২০১৩ সালের শিশু আইনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকলেও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য বিধি প্রণয়ন করা জরুরি। কেননা বিধি প্রণয়ন ব্যতিত প্রকৃতপক্ষে বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এখনো পর্যন্ত বিধি প্রণয়ন হয়নি।

বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিকল্প পরিচর্যার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাপ্রাপ্ত কন্যাশিশুদের সংখ্যা দেশের মোট সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কত শতাংশ এ বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। একদিকে যেমন কন্যাশিশুদের অনেকে বিকল্প পরিচর্যার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে এসব সুবিধার বিষয়ে সঠিক তথ্য বা পদ্ধতিগত বিষয়ে তারা অবহিত নয়। এছাড়া বাজেট প্রণয়নে শিশুদের জীবন মানোন্নয়নে যে পরিমাণ বরাদ্দের প্রয়োজন তা

খুবই অপ্রতুল। উপরন্তু মোট বাজেটে নারী ও শিশু যুক্ত থাকায় বিকল্প পরিচর্যার থাকা শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন দরকার।

বাংলাদেশে বিকল্প পরিচর্যা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শেষ আশ্রয়স্থল। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। প্রথমত, শিশুদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষাসাপেক্ষে সারা দেশে বিকল্প পরিচর্যায় থাকা কন্যাশিশুদের পরিসংখ্যান এবং তাদের সামগ্রিক উন্নতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত তথ্য সংরক্ষণ এবং আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকা। দ্বিতীয়ত, ২০১৩ সালের শিশু আইনের আওতায় দ্রুত বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং উক্ত বিধিমালায় কন্যাশিশুদের বিকল্প পরিচর্যায় থাকাকালীন সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কিছু বিষয় উল্লেখ রাখা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা-সহ একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি বলার এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শক থাকা, অবজ্ঞা কিংবা যৌন নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হলে যথাযথ সমর্থন পাওয়া ইত্যাদি। তৃতীয়ত, কন্যাশিশুদের ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার, বাল্যবিবাহের মত মারাত্মক অপরাধগুলোর বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। এক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন নীতিমালার ১৮নং অধ্যায়ে উল্লেখিত আটটি সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বিবেচনায় নেওয়া। চতুর্থ, কন্যাশিশুদের বিকল্প পরিচর্যার সেবা দিচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যবস্থা করা, যাতে করে গুণগত পরিচর্যা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। পঞ্চম, কন্যাশিশুদের শিক্ষার সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে করে বিকল্প পরিচর্যায় থাকা কন্যাশিশুরা বিকশিত হয়ে দেশের এবং মানব কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। স্বনির্ভর হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া। ষষ্ঠ, পথশিশুদের সংখ্যার তুলনায় সরকারি এবং বেসরকারি বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা অপ্রতুল। সেক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে, সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার যেসব কারণ আইনে উল্লেখ করা আছে, সেগুলোর বিষয়ে আইনি প্রয়োগ এবং গণসচেতনতা সর্বস্তরে তৈরির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা সম্ভব।

তাহমিনা হক*

কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নঃ জেন্ডার সমতা আনয়নে যুগোপযোগী কিছু ভাবনা

জাতিসংঘ ঘোষিত এবারের বিশ্ব কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'গার্লস ভিশন ফর দ্য ফিউচার'। এজন্য কন্যাশিশুদের জন্য বেশকিছু জরুরি পদক্ষেপ এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অনেকেরই মনে হতে পারে বিশ্ব এখন অনেক এগিয়ে গেছে, তাহলে কেন কন্যাশিশুর নাম নিয়ে দিবস, কেনইবা আলাদা করে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া। আমরা যদি পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, তাহলেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। যদিও কন্যাশিশুর ওপর সার্বিক তথ্য বা পরিসংখ্যানেরও যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে বিশেষ এক দুটি ক্ষেত্র ছাড়া কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের সার্বিক সূচকসমূহের ওপর তথ্য বা ডাটা পাওয়াটা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এর অন্যতম কারণ হতে পারে যে 'নারী' বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কন্যাশিশুর প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরবে এমন ধারণা পোষণ করা।

বাল্যবিয়ে কন্যাশিশুর জীবনের স্বাস্থ্য অধিকার, শিক্ষা, সহিংসতার ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠা, আয় উপার্জনের দক্ষতা ও স্বাধীনভাবে নিজের জীবন পরিচালনার অধিকারসহ সকল সম্ভাবনাকে ঝুঁকির সম্মখীন করে তোলে। আর এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে, যা ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের ১৮ বছরের নিচে বিবাহিতের শতকরা হার ৫১[১]।

এ দেশে বাল্যবিয়ের হার পূর্বের তুলনায় কম হলেও তা আশঙ্কাজনকভাবে কমেনি। একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, যদি বাল্যবিয়ে নিরসনে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা (২০৪১) পূরণ করতে হয়, তাহলে গত দশকে বাল্যবিয়ে বন্ধের যে তৎপরতা চলমান ছিল তার পরিমাণ আট গুণ বাড়াতে হবে।[২] আর যদি টেকসই উন্নয়নের ৫নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয়, তাহলে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের তৎপরতা ২২ গুণ বাড়াতে হবে।

[1] Multiple Indicator Cluster Survey BBS and UNICEF Bangladesh 2019
[2] Future Papers: Level of acceleration needed to achieve the UNFPA transformative results, UNFPA 2024

*** মানবাধিকার ও নারী অধিকার কর্মী**

জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-২০২৩ এর সাব সেকশন রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ১৪৬ এর মধ্যে সপ্তম।[৩] কর্মজীবী নারীর মধ্যে ৯৬ শতাংশ নারী ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করেন, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ৭৮.৪ শতাংশ।[৪] বাংলাদেশের কন্যাশিশু ও নারীরা পুরুষের তুলনায় সাত গুণ বেশি গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজ করে থাকে।[৫] ১৫ বছর এবং এর ঊর্ধ্বে মাত্র ১৯ শতাংশ নারীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে।[৬] জেন্ডার সোশ্যাল নর্মস ইনডেক্স ২০১৭-২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৯৯.৩৭ শতাংশ নারীর প্রতি কোনো না কোনো বায়াজনেস কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, ৮৮.০৭ শতাংশের মধ্যে ধারণা কাজ করে যে নারীদের চেয়ে পুরুষের চাকরি পাবার অধিকার বেশি এবং পুরুষরা নারীদের চেয়ে দক্ষ এক্সিকিউটিভ হয়।[৭] সামগ্রিকভাবে দেশের তিনভাগের একভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে, কিন্তু তারা মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা সম্পন্ন করে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ছাত্রদের (৩৪ শতাংশ) তুলনায় ছাত্রীদের হার (৪৬ শতাংশ) বেশি।[৮]

উপরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী এবং কন্যাশিশুরা পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে থাকার কারণ বা মূলের সন্ধান যদি আমরা করি, তবে দেখা যাবে যে একটি উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে নারী এবং পুরুষের মধ্যে, কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুদের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। কন্যাশিশুর চোখে দেখা ভবিষ্যৎ যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই, তবে কন্যাশিশুদের স্বপ্ন দেখতে পারার মতো নির্ভিক ও স্বাধীন পরিবেশ নিশ্চিত করাটাও অত্যন্ত জরুরি।

প্রকারান্তরে এটিও সত্য যে, অনেক বছর ধরে আমরা কন্যাশিশুর অধিকারের কথা বলছি এবং ঘুরে ফিরে অধিকারের কথাগুলোই নানা আঙ্গিকে বলছি তবুও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে আমরা অনেক ধীর পথে আছি। এর কারণ হিসেবে একটি কথা বলা যায় যে, সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণের পরিবর্তনের বিষয়টিতে অনেক দীর্ঘসূত্রতা কাজ করে। এই বিষয়ের সঙ্গে কন্যাশিশুর অধিকারের অগ্রগতির একটি ঘনিষ্ঠ সমর্থক রয়েছে।

সাম্প্রতিকালের ছাত্র আন্দোলনের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখবো কিশোরী ও তরুণী ও তরুণদের সমসংখ্যক হারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছিল। পত্রিকায় অগ্নিকন্যাদের ভূমিকা প্রায়শই দৃষ্টি কেড়েছিল। কিন্তু বিজয়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে

[3] United Nations Children's Fund (UNICEF): Ending Child Marriage: A profile of progress in Bangladesh. In. UNICEF, New York; 2020
[4] Labour Force Survey 2022
[5] Time Use Survey 2021
[6] Population and Housing Census 2022
[7] Gender Social Norms Index, (2017-2022).
[8] Keeping girls in schools to reduce child marriage in rural Bangladesh," Project Brief. Dhaka: Population Council, 2020.

যখন নেতৃত্বের স্বীকৃতির বিষয়টি আসে, তখন আমরা শুধু ছেলেদেরই দেখছি। নেতৃত্ব নামক গুণাবলির যে চিত্র আমাদের পিতৃতন্ত্রিক সমাজের মননে রয়েছে সেখানে কন্যাশিশুর অবয়বটি খুবই ক্ষীণ। এই বিষয়টি আমাদের আশির দশকের 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন' কথাটি মনে করিয়ে দেয়। এত দশক পরে এসে আমাদের এখনো কন্যাশিশুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন বা লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। যার মানে হচ্ছে কন্যাশিশু তার জন্য যে ধরনের ভবিষ্যৎ আঁকতে চায়, যে পৃথিবী সে প্রত্যাশা করে সেখানে পৌঁছানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

কন্যাশিশুর অধিকারের বিষয়টি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক বিষয়। কন্যাশিশুর ক্ষমতায় আস্থা রাখা, বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়া, তার জন্য একটি সুন্দর অবকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা এটি সিভিল ও পলিটিক্যাল রাইটস। তবে এটি দলীয় রাজনৈতিক বিষয় নয়। যার ফলে, কন্যাশিশুর অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, রীতি-নীতি, রাষ্ট্রীয় বার্ষিক পরিকল্পনা এসব প্রতিজ্ঞার অংশ হওয়া উচিত। শিশু আইন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ও বিধিমালা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন-সহ কন্যাশিশুর অধিকার বাস্তবায়নে যে নীতি ও আইনি কাঠামো রয়েছে তার সূচকের ভিত্তিতে অগ্রগতির পরিমাপ নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে জনগণের কাছে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নে সময়োপযোগী ও চলমান কিছু কৌশলের/পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন:

জেনজি-এর বৈষম্যহীন সংস্কৃতির অনুভূতিকে কাজে লাগানো: কৈশোর ও তারুণ্যের যে জোয়ার তৈরি হয়েছে সেখানে জেন্ডার সমতা ও নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন সংস্কৃতির চর্চাটি জোরালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে ত্বরিত ও ভালো ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বৈষম্যহীন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে একটি সমাজ সংস্কার হতে পারে।

সাইবার ও আইটি সেক্টরে জেন্ডার সমতার একটি চর্চা তৈরি করা: ব্যাপক সংখ্যক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেন্ডার সমতা বিষয়ক বার্তা প্রচার করা। কন্টেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের ভাষা, ছবি বা ইনফোগ্রাফ নির্বাচন করা যেতে পারে। তরুণী নারীবাদীরা কন্টেন্ট তৈরিকারকগণ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও ব্যাপকসংখ্যক তরুণ কন্টেন্ট ডেভেলপার-এর অংশগ্রহণ এবং এই সামাজিক আন্দোলন তৈরি করাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ সমাজ যখন জেন্ডার স্টেরিওটাইপের বিরোধিতা করবে এবং একটি সমসাময়িক ট্রেন্ড তৈরি হবে, তখন কিশোরী ও নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, উপরন্তু ছেলে ও মেয়েদের সহাবস্থান ও একত্রে অংশগ্রহণের বিষয়টি বৃদ্ধি পাবে।

শিশু আইন, সিডও, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, শিশু নীতিমালায় উল্লেখিত কন্যাশিশুর অধিকারের কথার বাস্তবায়ন চাই: কন্যাশিশুর অধিকার বিষয়ক দেশীয়, আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইনের বিশ্লেষণের চর্চা তৈরি করা প্রয়োজন। আইন ও কনভেনশন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোয় কোথায় প্রতিবন্ধকতা আছে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা কন্যাশিশুসহ কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

তরুণ নারীবাদের প্রসার ঘটানো: কন্যাশিশুর অধিকার বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানের জন্য তরুণ নারীবাদের সম্প্রসারণ এবং নারীবাদী সংস্থাগুলোকে সকল প্রকার সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। এই আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। যেন প্রতিটি কন্যাশিশু বুঝতে পারে তার চলার পথের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের রাজনীতির সম্পর্ক কী।

কন্যাশিশুদেরা দক্ষতা তৈরি ও ভবিষ্যতে চাকরির সুযোগ তৈরি-সহ ব্যবসা ও অন্যান্য আয় সংস্থানের প্রসার: কন্যাশিশুদের ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে ফরমাল সেক্টরে অনুগমনের জন্য দক্ষতা তৈরির কোনো বিকল্প নেই। শুধু ১৮ এর আগে বিয়ে নয় কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাওয়ার মধ্যে কন্যাশিশুর বিকাশ সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। চাকরির বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য প্রমাণ করতে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে বিংশ শতাব্দীর যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের সুযোগ রাখা প্রয়োজন। যাতে করে নারী আয়-উপার্জনের মধ্যে থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নারীকে জেন্ডার স্টেরিওটাইপ কাজের সীমা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হবার পথ তৈরি করে দিতে হবে। আমাদের সমাজে নারীর পেশাটা নির্ধারণ করা হয় তার জেন্ডার নরমস-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ নারীর সামাজিক যে জেন্ডার ভূমিকা এবং জেন্ডার সম্পর্ক তা কন্যাশিশু ও নারীকে অনেকটাই পেছনে টেনে ধরে। একটি অতি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। আশির দশক থেকে নারীকে ড্রাইভিং পেশায় আনয়নের জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ ২০২৪ সালে এসেও নারী ড্রাইভারের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যহারে কেন বাড়েনি তা হয়তো গবেষণা করলে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন নারী ড্রাইভাররের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে নারীর ড্রাইভিং পেশা স্বামী মেনে নিলেও শ্বশুরবাড়ির অনেকেই মেনে নেয় না কিংবা স্বামী লোকনিন্দার ভয়ে (স্ত্রী ছেলেদের পেশায় কাজ করে) স্ত্রীর পেশা গোপন রাখেন। এমনও শোনা গেছে যে দীর্ঘদিন ড্রাইভিং পেশায় নিয়োজিত নারী যখন শাশুড়ি হয়েছেন তখন মেয়ের স্বামী তার পরিচয়ও গোপন করেন তার সহকর্মীদের কাছে। সুতরাং সমাজ নারীকে যেভাবে নারীসুলভ পেশায় দেখতে চায় এই বিষয়টি কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নে একটি বড় অন্তরায়।

খেলাধুলায় নারী/তরুণীদের ভূমিকা: বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার কিংবা ফুটবলার হিসেবে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশী নারী ক্রিকেটার তৃষ্ণা দ্বিতীয় বারের মতো হ্যাট্রিক করে বিশ্বে সুনাম অর্জন করেন। গণমাধ্যমে খবরটি বেশ প্রশংসিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে খেলাধুলায় নারীর আগমন অল্পদিনের এবং সে তুলনায় প্রাপ্তি বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখা হচ্ছে কিংবা এ যাবৎ খেলাধুলায় অংশ নেওয়া কন্যাশিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, সামাজিকভাবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কেমন ছিল, তাদের পরিবারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, অন্যান্য কন্যাশিশুরা তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন। কেননা, অগ্রজদের প্রতিবন্ধকতা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা দুটিই ভবিষ্যতের কন্যাশিশুদের এগিয়ে যাওয়া ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন পর্যন্ত সমাজে একজন কন্যাশিশুর ভূমিকা একজন দক্ষ মানবসম্পদের মত বিবেচনা না করা হবে, ততদিন কন্যাশিশু তার চারপাশে সৃষ্ট বেড়াজাল ছিন্ন করে বের হতে পারবে না।

জেন্ডার রীতি-নীতি ও কন্যাশিশুকে বাড়ির সম্মান মনে করা: কন্যাশিশুর চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা বিশেষ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সহিংসতার ভীতিমুক্ত নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা ও নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্যাশিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি যেমন লক্ষ রাখা প্রয়োজন, তেমনি অতিমাত্রায় তার পোষাক ও চলাচল, বন্ধু তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে বাধা তার বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস তৈরির পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই কন্যাশিশুকে পরিবারের সম্মান মনে করে সেই সম্মান খর্ব হওয়ার ভয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া কিংবা কোনো আউট গোয়িং কাজে সম্পৃক্ত হতে বাধা প্রদান করা হয়। এই পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকে বের হতে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতারও পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিদ্যায় কন্যাশিশুদের অনুপ্রাণিত করা: শিক্ষাক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা ভালো করছে। কিন্তু শিক্ষার সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে কন্যাশিশুর ভবিষ্যতের যে ভিশন তা যেন এখনো প্রত্যাশিত অর্জনের মাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথ, সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে কন্যাশিশুদের অধিক হারে প্রবেশ এবং পরবর্তীতে চাকরি ও ব্যবসার বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সংখ্যা এখনো আশাপ্রদ নয়। তাই শিক্ষার সঙ্গে কন্যাশিশুর ভবিষ্যতের ভিশনের যোগসাজস এখনো পুরোপুরি নীতি-নির্ধারণীতে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় না। এক্ষেত্রে জেন্ডার সম্পর্কিত রীতি-নীতি একটি বিরাট অন্তরায়। কন্যাশিশুকে ভবিষ্যতের আত্মবিশ্বাসী, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত নারী হিসেবে না দেখে বরং তাকে সন্তান উৎপাদন ও মাতৃত্বের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করে দেখার যে মানসিকতা তা কন্যাশিশুর শিক্ষার অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যাহত করে। যেমন, নারীর বিয়ের বিষয়টি, চাকরি

বা ব্যবসার ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়টি, সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব এই বিষয়গুলো। আমাদের মেয়েদের আমরা চারিপার্শ্ব থেকে সহায়তা করতে চাই যেন তারা জেন্ডার প্রতিকূলতার বাধা পেরিয়ে, নিজের জীবনের লক্ষ্যটি নিজে সজ্ঞানে বুঝে ঠিক করতে পারে। সম্মান, মর্যাদায়, সমতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

পরিশেষে, যে বিষয়গুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো:

♦ পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুকে ভবিষ্যতের তথাকথিত নারীর ভূমিকায় নয়, বরং একজন দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা;

♦ রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নারী অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই কন্যাশিশুর অধিকারের বিষয়টি উহ্য থাকে। যেহেতু জীবন পরিক্রমায় কন্যাশিশুর ধাপটি প্রথমে, তাই কন্যাশিশুর এই বয়স সীমাকে প্রাধান্য দিয়ে সম্ভাবনা, প্রতিকূলতা প্রতিটি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত থাকা প্রয়োজন;

♦ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক বা পরীক্ষার ফলাফলে কন্যাশিশুর ভালো করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি শিক্ষক কর্তৃক কন্যাশিশুদের জেন্ডার বৈষম্যহীন একটি পরিবেশের মাধ্যমে মনোবল ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করা ও ছেলে-মেয়েদের সমানভাবে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;

♦ রাজনীতি, সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয়ে নেতৃত্বদানে আগ্রহী ও সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন;

♦ প্রচলিত জেন্ডার ধ্যান-ধারণায় গৃহস্থালি কাজ ও সেবামূলক কাজের দায়ভার থেকে কন্যাশিশুকে মুক্ত করে তার বিকাশে সহযোগিতা করা;

♦ আজকের দিনের কন্যাশিশুরা গ্রীন জব নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে;

♦ বাল্যবিয়েকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা;

♦ সহিংসতা ও ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চত করা;

♦ কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজের সময় টেকসই উন্নয়নের 'লিভ নো ওয়ান বাহাইন্ড' নীতি বিবেচনায় রেখে সকল স্তরের কন্যাশিশুদের নিয়ে কাজ করা।

মনে রাখা প্রয়োজন যে গার্লস ভিশন ফর দ্য ফিউচার কন্যাশিশুদের চাওয়া অনুযায়ী হতে হবে। সেজন্য কন্যাশিশুদের নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা তৈরিতে যেমন সহায়তা করতে হবে, তেমনি তাদের সঙ্গে নীতি-নির্ধারকদের মত আদান-প্রদানের একটি চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কন্যাশিশুদের সক্ষমতায় আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাতেই কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

বাবুল চন্দ্র সূত্রধর*

শিশুর হাত ধরে মানবিকতাবোধ জাগ্রত হোক

সাম্প্রতিককালে বিশ্বে যেসব প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার আধিক্য দেখা যায়, তন্মধ্যে অন্যতম হলো মানবিকতাবোধ। মানবিকতাবোধ প্রত্যয়টিতে এসে পরিশেষে মিলিত হয় আরও অনেক আলোচিত প্রত্যয়, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধ, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা, হানাহানি, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল প্রভৃতি নেতিবাচক ও ক্ষতিকর উপাদান। মূলত এসব অনভিপ্রেত তৎপরতা থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মানবিকতার দ্বারস্থ না হয়ে উপায় থাকে না। আবার দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানবিকতার দ্বারস্থ হয়েও তেমন কোনো উপকার হচ্ছে না, আলোচনা-পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে এহেন উদ্যোগগুলো। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষ আজ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব সাফল্যের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে; আবার একইসঙ্গে মনোজগতটাকে করে ফেলেছে সঙ্গীন, ক্লীব্! কারো প্রতি কারো কোনো দায়বদ্ধতা নেই, অন্যরা বাঁচুক মরুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই, শুধু 'আমার' এবং 'আমাদের' কল্যাণ নিয়েই অতিশয় ব্যস্ত সময় পার করছে আধুনিক সভ্যতার কাণ্ডারিরা।

আজকাল অবশ্য মানবিকতার সম্পূরক হিসেবে 'মানবাধিকার' পদের ব্যবহার অনেক বেশি। কোথাও নীতিবিরুদ্ধ কিছু ঘটলেই মানবাধিকারের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কথা হলো, যেখানে মানবিকতা নেই সেখানে অধিকারের কথা আসে কীভাবে? প্রত্যয়গত ধারণাটুকু তাহলে তুলে ধরতে হয়। মানবিকতা বলতে বোঝায় মানুষ হিসেবে কী কী করণীয় ও কী কী করণীয় নয়, সেসবের সমষ্টি; অর্থাৎ, মানুষের জন্য যা শোভনীয়– এক কথায় কর্তব্য। আর, মানুষের সঙ্গে অধিকার পদ যুক্ত হলে বোঝায় মানুষ হিসেবে সমাজ থেকে ন্যায্যভাবে কী কী পাওয়া উচিত, সেসবের সমষ্টি। মানবিকতা দেওয়ার বিষয় আর অধিকার পাওয়ার বিষয়। সাধারণত, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন মানুষ যা যা দিয়ে থাকে (যেমন, আইন মান্য করে, কর প্রদান করে,

* মানবাধিকারকর্মী ও গবেষক

ভোট দেয় প্রভৃতি) সেগুলোকে কর্তব্য, আর যা যা পেয়ে থাকে (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মত প্রকাশ প্রভৃতি) সেগুলোকে অধিকার বলা হয়। কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে কার্যকর মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত না হলে নানা প্রকারের বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই বিপত্তিরই এক নগ্ন প্রকাশ লিঙ্গবৈষম্য।

পৃথিবীর বুকে মানব সমাজের মত এত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাণী বোধ হয় আর নেই। মানুষের মধ্যে আচরণগত বিভেদ অপরিমেয়, পরিসংখ্যানে এসবের হিসাব হওয়ার মত নয়। আবার একই ব্যক্তি/ব্যক্তিসমষ্টির নিকটও নানা সময় নানা ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায়। এর আসল কারণ আর কিছু নয়, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার সুচিন্তিত ও সুচতুর প্রয়াস, যার ভূমিরেখায় অবস্থান করে বৈষম্যমূলক সামাজিক স্তরবিন্যাস। এরই ধারাবাহিকতায় সুবিধামত সমাজের মানুষকে বিভক্ত করে বিভিন্ন ধরনের বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে। অবলা (নারী), সংখ্যালঘু, অস্পৃশ্য, অল্প বয়স্ক, দরিদ্র, ক্ষমতাহীন, দাস, উদ্বাস্তু প্রভৃতি নাম-বিশেষণের আড়ালে মূলত কাজ করে এই লোলুপ স্বার্থচিন্তা। এই প্রয়াসের থাবা থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। কন্যাশিশু ও পুত্রশিশু অভিধা একই উৎস থেকে আবির্ভূত।

নদী থেকে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে জেলেরা নদীর নানা স্থানে বাঁধ দেয়; কারণ পানির প্রবাহ বজায় রেখে মাছ ধরা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আবার পুরো নদী একসঙ্গে সেচ দেওয়াও সম্ভব নয়। মানবিকতাবিমুখ, মতলববাজ ও কুচক্রীমহলের স্বার্থসিদ্ধির প্রধান অবলম্বনও এরকমই। তারা সমাজের মানুষকে নানা ভাগে-উপবিভাগে বিভক্ত করে সমাজের একমুখী প্রবাহ চিরতরে বন্ধ করে দিতে উদ্যত হয়। সকল মানুষ সম মতাবলম্বী হলে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আশঙ্কা থাকে, সফলতার সম্ভাবনা কমে আসে। এভাবে সুবিধা অনুযায়ী একেক ভাগে একেক সময়ে তারা হানা দেয় এবং স্বার্থ চরিতার্থ করে নেয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার)-এর 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য' অংশের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ''২৮.১। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। ২৮.২। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।" আর, মৌলিক অধিকারের বিষয়টিকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সম্যক উপলব্ধি করা যায় এই ভাগের শুরুতে, অর্থাৎ, ২৬ অনুচ্ছেদ পাঠ করলে, যেখানে বলা হয়েছে: ''২৬.১। এই ভাগের বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। ২৬.২। এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া

যাইবে।" ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ইং থেকে কার্যকর সংবিধানটির এই অতি মূল্যবান নির্দেশনাটির কতটুকু অর্জিত হয়েছে, এর জবাবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মানুষের কর্তব্য পালনের নমুনা। সহজ কথায় বলতে গেলে, গোটা সংবিধান মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই, রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে সংবিধানের আলোকে কতটুকু তৈরি করতে পেরেছে, তা অনুধাবনের জন্য এই জবাবটির মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ নিরীক্ষাই যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৮৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে আবির্ভূত জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার সনদ'-এর অনুচ্ছেদ ২ (শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা)-এর ১-এ বলা হয়েছে: "অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতায় প্রতিটি শিশুর জন্য এই সনদে উল্লেখিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, সামর্থ্য জন্মসূত্রে কিংবা অন্য কোন বংশগত অবস্থানের কারণে বৈষম্য করা যাবে না।" কী চমৎকার কথামালা! বাস্তবক্ষেত্রে কী আমরা এসবের উপস্থিতি খুঁজে পাই?

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উদ্যোক্তা, গণমাধ্যম, ক্রীড়া প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আজ নজরে পড়ার মত। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। একটি তথ্য দিয়েই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়: বাল্যবিয়ের বিচারে বাংলাদেশ এশিয়ার শীর্ষে অবস্থান করে। প্রায় ৫১% মেয়ে এখানে বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে। ২৭% মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৫ বছরের কম বয়সে। এ পরিস্থিতির জন্য অভিভাবকদের অনিরাপত্তাবোধই প্রধানত দায়ী। এতে করে শুধু বাল্যবিয়ের শিকার শিশুগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এ ক্ষতি এসে নিঃশেষে গোটা সমাজেই পতিত হয়; কারণ কথায় আছে, একটি বাল্যবিয়ে তিনটি প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে জাতীয়ভাবে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের জন্য বিস্তর উদ্যোগ থাকলেও কেন এটি কার্যকর হতে পারছে না, তার মনো-সামাজিক চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে উদ্‌ঘাটন করা খুব জরুরি। সাথে সাথে এহেন আচরণ যে অখণ্ড হিংসারই একটি প্রকাশ, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করতে হবে।

সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কন্যাশিশুর বাবা-মা মানেই অভাগা, আর পুত্রশিশুর বাবা-মা মানেই ভাগ্যবান। বিষয়টি ধারণার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নেই। আমি এমন বাবা-মাকে দেখেছি যারা কন্যাসন্তান জন্মের পর কান্নাকাটি করেছেন; আবার এমন বাবা-মাকেও দেখেছি যারা পুত্রসন্তানকে নিয়ে ভবিষ্যতের উন্নয়নের ছক কষেছেন শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে নয়, বিয়েতে প্রচুর যৌতুক পেয়ে ধনী হওয়ার কল্পনায়। এ চেতনা থেকে পুত্রশিশু ও কন্যাশিশুর প্রতি যত্ন বা মনোযোগে বিস্তর প্রভেদ তৈরি হয়ে যায়।

একটি শিশু বুঝে ওঠার আগেই যদি হিংসার চর্চা লক্ষ করতে থাকে তারই আপনজনের নিকট থেকে, তাহলে তার মানসিক বিকৃতি তো হতেই পারে, হোক সে পুত্র বা কন্যা। হিংসার বীজ একবার কারো অন্তরে স্থাপিত হয়ে গেলে তা উপড়ে ফেলা অত্যন্ত কঠিন। বরং এটি শুধু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। লিঙ্গভিত্তিক হিংসা বা বৈষম্য ক্রমে পরিণত হয় নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বা ভেদাভেদে। অবশ্য কন্যাশিশু পুত্রশিশু –এগুলোও সাম্প্রদায়িক পদ বটে। হিংসা ক্যান্সারের মত বহু রোগের সমষ্টি। এটি আপাতত প্রতিকারযোগ্য হলেও সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের সকল অংশেই এর প্রভাব থাকে; এমন নয় যে, যকৃত বা বিশেষ কোনো অঙ্গে তা সীমাবদ্ধ থাকে। এই মহারোগ যার মানসলোকে একবার প্রবেশ করতে পেরেছে, তার আর এ থেকে মুক্তি নেই। সে যেকোনোভাবেই হোক, হিংসার উপাদানের সন্ধানে থাকে এবং পেলেই 'অবশ্য পালনীয়' হিসেবে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়ে ওঠে। ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, ভাষা, অবস্থান, বর্ণ, শিক্ষা-দীক্ষা এমনকি জ্ঞান-বুদ্ধি পর্যন্ত তার কাছে হিংসা বা বিভেদের উপাদান হিসেবে ধরা দেয়। এমন নয় যে, সে ধর্মের বিষয়ে উদার এবং লিঙ্গের বিষয়ে হিংসুটে; অথবা ভাষার বিষয়ে উদার এবং শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে কট্টর। সুবিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত চাণক্যের হিতোপদেশে আছে–

"তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়া মুখে বিষম।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্বাঙ্গে দুর্জনে বিষম।"

অর্থাৎ, সাপের বিষ দাঁতে, মাছির বিষ মুখে, বিচ্ছুর বিষ পুচ্ছে আর দুর্জনের বিষ তার সর্বাঙ্গে।

দেশে প্রচলিত একটি গল্প এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা যায়। গল্পটি এক গরুচোরের।

গরুচোরটি প্রায় প্রতি রাতেই তার কাজে বের হয়। কোনোদিন সফল, আবার কোনোদিন বিফল হয়। মাঝে মাঝে কিছু আপদ-বিপদও আসে। নিকটজনের বাধা ও শালিসের শাস্তি কোনো কিছুতেই সে কান দেয় না। অপমান ও আপদ-বিপদের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে পরিবারের লোকজন তাকে রাতের পর রাত ঘরে আটকে রাখে। শেষ পর্যন্ত চোরটি রাজী হলো সে রাতে আর বাড়ির বাইরে যাবে না। সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরেই সে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে– এক ঘরের গরু অন্য ঘরে সে নিয়ে বেঁধে রাখে। বাড়ির লোকজন সতর্ক হলে একাদিক্রমে নারকেল, সুপারী, লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতির দিকে তার স্বভাবসুলভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যতদিন শরীর চলমান ছিল সে তার প্রিয় কাজ থেকে সরে আসতে পারেনি।

শিশুর মূল পরিচয় 'শুভ সূচনা'। এই শুভ সূচনাকে ইচ্ছা করলেই শুদ্ধির সূচনা ধরে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ বলতে পারার যে অমীয় গুণ, সেটি এ সময় থেকেই চর্চা শুরু করা দরকার। অঙ্কুরিত হওয়ার পর বৃক্ষশিশুকে পরিচর্যাকারী সোজা হয়ে (বা পরিচর্যাকারীর পছন্দ অনুসারে) ওঠার জন্য নানা কার্যকর

ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে এটি ঠিক সেভাবেই বাড়তে থাকে। আমরা মানবশিশুকেও সেভাবে গড়ে তুলতে পারি; তবে আগে নিজেদেরকে সেভাবে গঠিত হতে হবে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে শিশুদেরকে সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত করে তোলা যায়।

মানব সমাজকে ঢেলে সাজানোর কথা শুনে আসছি অনেক আগে থেকেই, যার সরল অর্থ হচ্ছে নতুন করে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয় এই নতুনের যাত্রা শুরু হতে পারে শিশুদের হাত ধরে। কেন ও কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে, এ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা ও পর্যালোচনা আবশ্যক। আমি আমার মতামতটি সংক্ষেপে তুলে ধরে এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

আমরা চাই একটি বৈষম্যমুক্ত ও যুক্তিশীল সমাজব্যবস্থা। এ উদ্দেশ্য সাধনে শুধু লিঙ্গবৈষম্য দূর করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সার্বিকভাবে সমাজকে বৈষম্যমুক্ত করা। সমাজের মানুষই পারে সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভের মনো-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত নীতি-নৈতিকতা, যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। নীতি-নৈতিকতার অন্তঃস্থলে স্থাপন করতে হবে মানবিকতাকে, যার প্রভাবে সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার মত প্রয়োজনীয় উপাদানের সক্রিয় উপস্থিতি থাকবে।

মাসুমা বিল্লাহ*
সেমন্তী মঞ্জরী**

শিশুর হাত ধরে মানবিকতাবোধ জাগ্রত হোক

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎক্ষণিক চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ১৯৯৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের শতকরা এক ভাগেরও কম মানুষ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারতেন (*বিবিসি*, ২০১৭)। সেখানে ২০২৪ সালে আমরা জেনেছি যে, প্রায় ৫.৪ বিলিয়ন মানুষ সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করেন, যা মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৬৭.১ ভাগ (*স্ট্যাটিস্টা*, ২০২৪)। এই সময়ে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা একটি অপরিহার্য সক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার (social and digital inclusion) সঙ্গে কম্পিউটার লিটেরেসি, মিডিয়া লিটেরেসি, আইসিটি লিটেরেসি এবং ইনফরমেশন লিটেরেসি– এই চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে সন্নিবেশিত। ধারণা করা হয় যে, ২০৩০ সাল নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৮০ শতাংশ চাকরির জন্য ডিজিটাল দক্ষতার প্রয়োজন হবে (*ইউনিসেফ*, ২০২৩)।

এখন দেখা যাক, ডিজিটাল দক্ষতায় কিশোরী ও যুব নারীরা (১৫-২৪ বছর বয়সী) কতটা যুক্ত। আবার এটাও বহুল আলোচিত যে, বিশ্বব্যাপী কিশোরী ও যুব নারীরা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। আবার আপনারা জেনে থাকবেন যে, শিশুদের জন্য যেমন- জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার সনদ' ও নারীদের জন্য 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' রয়েছে, তেমনি কিশোরীদের জন্য আলাদা করে জাতিসংঘের কোনো সাংবিধানিক কাঠামো বা কন্সটিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক নেই। সেক্ষেত্রে তাদের অধিকার, চাহিদা ও অগ্রগতি অনেকটাই বৈষম্যের শিকার এবং কার্যত তা আলাদা করে পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়নের সুযোগও সীমিত।

*** প্রোগ্রাম হেড, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক**
**** ম্যানেজার, কমিউনিকেশন, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক**

এবার আসি, আমাদের দেশে ডিজিটাল লিটেরেসি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। আমাদের বহুল চর্চিত এবং গভীরভাবে প্রথিত পিতৃতন্ত্র কন্যাশিশু, কিশোরী ও নারীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষাসহ মৌলিক অধিকারকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে। বাংলাদেশে বসবাসকারী কন্যাশিশুদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ১৮ বছর বয়সের আগে বাল্যবিয়ের শিকার হয় (*ইউএনএফপিএ*, ২০২৪)। ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের ১,০০০ জনের মধ্যে ৭৩ জন কিশোরী সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে (*বিশ্ব ব্যাংক*, ২০২২)। ৫৪ শতাংশ নারী অন্তত জীবনে একবার শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (*বিবিএস*, ২০২৩)। এহেন বাস্তবতায় কিশোরী মেয়েটির জীবন দক্ষতার প্রয়োজনে ডিজিটাল লিটেরেসি হয়তো বিবেচনার তালিকায় অনেক পরে অবস্থান করে, তথাপি দেশ ও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময় এসেছে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ও পরিবর্তন আনার।

২০২২ সালের বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট যুবদের সংখ্যা সাড়ে চার কোটি, যার মধ্যে ১০ শতাংশ ৫-১৯ বছর বয়সী। এই তরুণ জনগোষ্ঠী মোবাইল ফোনের সহায়তায় বিপুল সময় ব্যয় করেন অনলাইন জগতে। তাদের চিন্তা-চেতনার একটা বড় পরিসরের বিকাশ ঘটে মূলত সামাজিক শিক্ষায় স্ব-শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে এবং এরই ফলে ডিজিটাল জগতে তাদের বিচরণ হয়ে ওঠে সহজ থেকে সহজতর। এখানে কন্যাশিশু, বিশেষ করে মেয়েদের কথা পৃথকভাবে ভাবতে হয়, কারণ পিতৃতন্ত্রের গৎবাঁধা ধারণা, সামাজিক স্টেরিওটাইপ, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করার দক্ষতা ও সুযোগ, এই সকল বিষয়সমূহ কন্যাশিশুর জন্য, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী কন্যাশিশুর ডিজিটাল দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তীব্র বাধা হিসেবে কাজ করে।

২০২৩ সালের ইউনিসেফের ডিজিটাল লিটেরেসি প্রতিবেদন বলছে যে, মেয়েদের স্মার্টফোন ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছেলেদের তুলনায় ১.৮ ভাগ কম। নানা সময়ে গ্রামীণ অঞ্চলে গিয়ে আমরা হয়তো দেখি যে একটি বাড়িতে একটি মাত্র ফোন বা ডিভাইস রয়েছে। তবে সেটি ব্যবহার করার অধিকার হয়তো অধিকাংশ মেয়েরাই নেই। আবার, স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। তবে বলতেই হয়, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব একই বয়সের মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঘাটতি কম দেখা যায়। কারণ, প্রচলিত গৎবাঁধা ধারণা যেমন, 'কম্পিউটার বা মোবাইল ছেলেরা বেশি বোঝে', এই ধারণাটি মেয়েদের আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও অনুপ্রেরণাকে বাধাগ্রস্ত করে। অন্যদিকে, তরুণরা কন্টেন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের বেশি সুযোগ পায়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েদের অভিভাবকেদের মধ্যে

অনলাইনে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা কাজ করে, যা মেয়েদেরকে ফোন অথবা ল্যাপটপ ব্যবহার করা থেকে নিরুৎসাহিত করে এবং সর্বোপরি তাদের শেখার সুযোগ কমিয়ে আনে অনেকটুকুই।

আবার, শুধু ব্যবহার বৃদ্ধি হলেই ডিজিটাল দক্ষতা বাড়বে ব্যাপারটি এমনও নয়। বর্তমানে ডিজিটাল স্পেস শুধু দক্ষতা নয়, সঠিকভাবে ব্যবহার করা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩৯ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অর্থাৎ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। ডিজিটাল স্পেসে অংশগ্রহণ করার অধিকার এবং সামর্থ্য যেহেতু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তৈরি হয়েছে, এখানে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার উত্থাপনও অনিবার্য হয়েছে, যা সবসময় হয়তো সঠিক নয়। ভুল তথ্য বা মিসইনফরমেশন, যা মানুষকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এর ঝুঁকি অনেকটাই রয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় দেখা যায় কিশোরী ও যুব নারীরা এই সমস্যা দ্বারা সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হয়। অনলাইনে ভুল তথ্য ও অপপ্রচার একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বড় বিষয়, যা কিশোরী ও যুব নারীদের শিক্ষা, অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করছে এবং মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার করার ক্ষমতা ও এ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব প্রায়শই ডিজিটাল অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য মূল বাধা হিসেবে দাঁড়ায় (*জিএসএমএ*, ২০২২)। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে মেয়েদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস ও সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত এবং অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তি-সংক্রান্ত জেন্ডার স্টেরিওটাইপগুলো মোকাবিলা করে মেয়েদের ডিজিটাল দক্ষতা এবং সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই আমাদের শিক্ষকদের কাছেও প্রত্যাশা যে, কন্যাশিশুদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধিতে তারা বিশেষভাবে সহায়তা করবেন। কিশোরী ও যুব নারীদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং প্রস্তাবিত সমাধান আলোচনার মাধ্যমে যেন ওঠে আসে, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি, যে সকল যুব সংগঠন যাদের কিশোরী ও যুব নারীদের অধিকার নিয়ে কার্যক্রম রয়েছে, যে সকল প্রতিষ্ঠান (যদিও তারা সংখ্যায় খুব কম) যুব নারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তাদেরকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সকলেরই বুঝতে হবে জেন্ডার সমতা অর্জনে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল স্পেসে দক্ষতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা কিশোরী ও যুব নারীদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিবে এবং সমাজে তাদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হবে।

নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আমাদের বিপুল সংখ্যক কিশোরীকে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার আড়ালে রেখে সম্ভাবনার আগামীকে ধরা যাবে না। সমতার পৃথিবী বিনির্মাণ করবে প্রযুক্তি– এটিই প্রযুক্তির কাছে মানব সভ্যতার কামনা। জেন্ডার সমতার জন্য সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে সর্বোত্তম উপায়ে। অন্যসব ক্ষেত্রের মতো প্রযুক্তির প্রাপ্তিতে এবং ব্যবহারে নারী নিজেকে প্রমাণ করেই এগিয়ে যাবে, যেমনভাবে প্রমাণিত যে নারী আজ বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সকল দ্বার সকল কিশোরীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাক– এটি আমরা আশা করি।

মাহফুজুর রহমান মানিক*

শিক্ষায় কন্যাশিশুর এগিয়ে চলা ও বাল্যবিয়ের চ্যালেঞ্জ

কন্যাশিশু প্রাণ চঞ্চল। তাদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। কর্ম ও তৎপরতায় তারা অগ্রগামী। শিক্ষা ক্ষেত্রেও যে তারা এগিয়ে, সে ধারা আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখে আসছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার বেশি। এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেই দেখা যায়, মেয়েরা কতটা ভালো করছে। চলতি বছরের মে মাসে প্রকাশিত এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল অনুসারে দেখাচ্ছে, টানা পাঁচ বছর মেয়েরা এগিয়ে। মেয়েদের এগিয়ে থাকা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। বরং নানা কারণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কন্যাশিশুর মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর যেই ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে, সে কারণেই তারা শিক্ষায় এগিয়ে থাকে। কন্যাশিশুদের অধিকাংশই একদিকে যেমন গৃহস্থালির কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করে তেমনি পড়াশোনার ব্যাপারেও তারা মনোযোগী। শ্রেণিকার্যক্রমেও কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ বেশি দেখা যায়। জানার বাসনা সবার মধ্যেই থাকে, তারপরও বিশেষভাবে কন্যাশিশুদের আগ্রহ আশাজাগানিয়া। শ্রেণি কার্যক্রমের বাইরেও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ তথা সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ ও তৎপরতায়ও কন্যাশিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কন্যাশিশুরা যে শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে প্রথম ভূমিকা বা অবদান তার নিজের।

পাশাপাশি এটাও স্বীকার করতে হবে, কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অভিভাকরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ মা-বাবা ও অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ অনেকে বেড়েছে। এটা অবশ্য ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার

* সাংবাদিক ও শিক্ষা গবেষক

ব্যাপারে অভিভাবকদের আগ্রহের কারণে আমরা দেখছি, প্রাথমিক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছরের হিসেবে প্রাথমিকে শতভাগের কাছাকাছি শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষামুখী।

সামাজিক সচেতনতাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একসময় সামাজিক একটা ধারণা ছিল, মেয়েদের পড়িয়ে লাভ নেই। তারা পরবর্তীতে পরিবারের উপকারে আসবে না ইত্যাদি। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এটা প্রমাণ হয়েছে, মেয়েরা পরিবারের জন্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে শিক্ষিত মেয়েদের পরিবারে অবদান কোনো ক্ষেত্রেই কম নয়। এমনকি মা-বাবা বয়স্ক হয়ে গেলেও তাদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেজন্য সমাজও নারীর শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে। অনেক জায়গায় মেয়েদের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা থাকলেও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

অস্বীকার করা যাবে না, একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবেও মেয়েদের শিক্ষায় বরাবরই সরকারগুলো গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের উপবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি ও বিনামূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্তত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সহায়ক হয়েছে। সেজন্য উচ্চ মাধ্যমিক পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নারীর পদচারণা বাড়ছে।

মেয়েরা যেমন উচ্চশিক্ষায় পড়ছে, তেমনি উচ্চপদেও আসীন হচ্ছে। রাজনীতিতে তাদের অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং মন্ত্রিপরিষদে তারা যেমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে, তেমনি বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদেও নারীর হার উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সচিবসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে সমাজ এটা বুঝতে পারছে, মেয়েদের পড়াশোনার কারণেরই তারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিকে ও মাধ্যমিকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকার বিপরীতে বাল্যবিয়ে বড় সমস্যা। বাল্যবিবাহের কারণে কন্যাশিশুরা বিদ্যালয় হতে ঝরে যায়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে এ সমস্যা প্রকট। চলতি বছরের ৪ মার্চ সমকালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: নবম-দশম শ্রেণিতে মেয়েদের বেঞ্চ খালি। সেখানে কুড়িগ্রামের চিলমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী এবং সদরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বাল্যবিবাহের ভয়ানক চিত্র তুলে এনেছিল প্রতিবেদক। সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এক বছরে গড়ে ১৫/২০ শিক্ষার্থীর বিয়ে হয়েছে। দরিদ্রপীড়িত এলাকায় সামাজিক অবস্থান এবং নিরাপত্তার অভাবেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের দ্রুত বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। একজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, প্রতিবেশীর বাজে কথা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এমনকি একজন কাজীর বক্তব্য অনুসারে, স্থানীয় জনপ্রতি নিধিরাই এই বাল্যবিয়ে সংঘটনে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। তারা

এর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে গোপনে বাল্যবিয়েতে সহযোগিতা করছেন। বস্তুত তারা কঠোর হলে এভাবে বিদ্যালয় হতে মেয়েদের ঝরে পড়া কমতে পারে।

তার মানে মেয়েদের শিক্ষায় অভিভাবকদের সচেতনতা কিংবা সামাজিক জাগরণে হলেও তা দেশের সর্বত্র সমান নয়। যে কারণে বাল্যবিয়ে দেখা যাচ্ছে। মে মাসে প্রকাশিত ইউনিসেফের প্রতিবেদনে, ৫১ শতাংশ তরুণীর শৈশবে বিয়ে হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আঠারো বছরের নিচে এমনকি পনের বছরের নিচের শিশুদেরও বিয়ে হচ্ছে। যার প্রভাব শিক্ষায় পড়ছে। প্রশাসন বিভিন্ন সময়ে বাল্যবিয়ে রোধে তৎপর হয়; ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিয়েতে ভূমিকা পালনকারী বর-কনের আত্মীয়-স্বজনদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনাও ঘটেছে। আরও আশাব্যাঞ্জক খবর, অনেক কিশোরী নিজেই নিজের বিয়ে ঠেকাতে ভূমিকা পালন করেছে। নানা সামাজিক সংগঠনও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে সকল উদ্যোগের সুফল তখনই পাওয়া যাবে যখন তার পরিবার ঠিক থাকবে। পরিবারের দারিদ্র্য দূরীকরণ জরুরি। তারপরই পরিবার শিক্ষায় উদ্যোগী হবে। প্রত্যেক মেয়ের শিক্ষা নিশ্চিত হলে বাল্যবিয়ে থাকতে পারে না। কোনো মেয়ে যেন শিক্ষা হতে ঝরে না পড়ে সেদিকে সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট হতে হবে। কোনো পরিবার মেয়ের শিক্ষার খরচ চালাতে না পারলে প্রতিবেশীদের এগিয়ে আসা এবং তাদের জন্য সরকারি উপবৃত্তির পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

বাল্যবিয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলে আমাদের কন্যাশিশু আরও এগিয়ে যাবে। তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করলে দেশের অর্থনৈতিক কাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

মিথুশিলাক মুরমু*

চা বাগানের আদিবাসী কন্যাশিশু

হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট ও সুনামগঞ্জ– এই চার জেলার সমন্বয়ে বৃহত্তর সিলেট বিভাগ গঠিত। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা আবাদ প্রকল্প 'মালনিছড়া চা বাগান' প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রায় একই সময়ে ভারতের আসামেও প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় ১৬৭টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৫টি চা বাগান নিয়ে বৃহত্তর সিলেট গড়ে ওঠেছে। দেশের চা বাগানগুলোতে ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, গুয়াহাটি, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা শ্রমিকদের নিয়ে এসে আসাম ও বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন চা বাগানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য করেছিল বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে।

চা শ্রমিকরা চা বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বসত ভিটার স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। বোঝানো হয়েছিলো 'গাছে ঝাঁকুনি দিলে পয়সা পড়ে, এমুনি জায়গা'; 'গাছ হিলায়ে তো পয়সা মিলেগা'। অনেকটা দরিদ্রতা অবসান কিংবা স্বচ্ছল জীবনের প্রত্যাশায় হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক পাড়ি দিয়েছিল চা বাগানের চার দেওয়ালের কর্মজীবনে। এদের মধ্যে ছিল– সিং, ডুকলা, পাইনকা, মুসহর, বাড়াইক, বিহারি, পাহান, সাদরি, তেলেগু, বানাই, বাউরি, মুন্ডা, বীন, ভুজপুরি, ভূমিজ, বোনাজ চৌহান, গন্ডো/গানজু, গুর্খা, হালাম, খাড়িয়া, কন্দ, মাদ্রাজি, মুশহর, নায়েক, নুনিয়া, উড়িয়া, পানিখা, বাশফোর, কৈরি, বাগদি, কালিন্দি, রাউতিয়া, গোয়ালা, গৌরি, রাজভর, মৃধা, মাহালী, পাত্র, শব্দকর, পাহাড়ি, তেলি, অলমিক, রাজপূত, অসমিয়া, বার্মা, ভর, ভোক্তা, ভূইয়া, বুনার্জি, চাষা, দোষাদ, গারো, ঘাটুয়ার, গিরি, গরাইত, গোস্বামী, গড়, গয়েশ্বর, হাজরা, জৈন্তা পাত্র, জোড়া, কাহার, কালোওয়ার, কানু, কর্মকার, কেওট, খোদাল, কোল, ভীল, কোরা, কুমার, কুর্মি, লোহার, মাহারা, মাঝি, মালো, মারমা, মনিপুরি, নাইডু, ওরাঁও, পাল, পাশি, ফুলমালি, পন্ডিত, প্রধান, রাজবল্লভ, রাজবংশী,

* লেখক ও উন্নয়নকর্মী

রাজঘর, রাজুয়ার, রিলে, রবিদাস, সাধু, সাঁওতাল, শবর, শীল, শুক্লবৌদ্ধ, তাঁতি, তংলা, ত্রিপুরা, মাহাতো, তুরী, নিষাদ, দোসাদ, পাহাড়িয়া, মালী, বাঙালি এ রকম নানা ঐতিহাসিক জাতিগুলোর অনেকেই নিজ জন্মমাটি ও আত্মপরিচয় থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে একটা সময় অনিবার্যভাবে বহুজাতিক কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত বাগানের স্থায়ী চা শ্রমিক হয়ে যায়। জাতি, গোত্র, বংশ, নাম, পরিচয় সব মুছে চা বাগানে এদের এক নতুন নামকরণ হয় কুলি, পাত্তিওয়ালী, চা জনগোষ্ঠী। নৃ-তাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে চা বাগানের এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কেউ প্রাক্ দ্রাবিড়ীয়, কেউ আদি অষ্ট্রালয়েড়, কেউবা মঙ্গোলীয় আদিবাসীর অন্তর্ভুক্ত।

চা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হৃদ্যতা ক্রমশই বেড়েছে, সম্পর্কের টানেই বাগানের অভ্যন্তরে থাকা এবং কাছ থেকে জীবন সংগ্রামকে উপলব্ধি করেছি। চা বাগানে কন্যাশিশুদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও জীবন সংগ্রাম বড়ই বেদনাদায়ক। কখনো কখনো মনে হয়, রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র অর্থাৎ স্টেট এবং টি স্টেট যেন আলাদা পরিচয়। রাষ্ট্রের নাগরিক থেকে চা বাগানের নাগরিকদের বৈসাদৃশ্যের বিস্তর ফারাক রয়েছে।

দেশের সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম-সহ দেশের চা বাগানগুলোতে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি শ্রমিক রয়েছে, তার মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৬৭টি বাগানে দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৫ টাকাতে উন্নীত করা হয়েছে। গবেষণায় এসেছে, চা বাগানের ৬১ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। এরমধ্যে প্রায় ৪২ শতাংশ অতিদরিদ্র, ২০ শতাংশ শ্রমিক এখনো খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। নারী প্রধান পরিবারগুলোতে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলক বেশি। চা শ্রমিকেরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা-সহ প্রায় সব সূচকেই পিছিয়ে আছেন। এদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি। বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা সহিংসতার শিকার হয়। মাত্র ১৫ শতাংশ শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা পান। অপুষ্টিতে খর্বকায় চা বাগানের ৪৫% শিশু। চা শ্রমিকের ৬০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়।

'মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে' (এমআইসিএস)-এর জরিপ অনুযায়ী, হবিগঞ্জের চা বাগানগুলোতে শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত ২৯.৮ শতাংশ চা শ্রমিক শিশু, মৌলভীবাজারে ১৫.৬ শতাংশ এবং সিলেটে ১৯.৩ শতাংশ। খাদ্য সংকট, বাসস্থানের অভাব ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিত না হওয়ায় চা শ্রমিক শিশুরা পড়ালেখা বাদ দিয়ে বাধ্য হয়ে চা বাগানে কাজে ভিড়তে হচ্ছে। যে বয়সে শিশুদের ব্যাগ কাঁধে হাসিখুশিতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা, সে বয়সে তাদেরকে ভোরে ঘুম থেকে উঠে চা বাগানে ভিড়তে হচ্ছে জীবিকার তাগিদে।

দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী, চা বাগানে ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকলেই বাগান কর্তৃপক্ষকে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে; অথচ দেশে ১৬৭টি চা বাগানে প্রাথমিক

বিদ্যালয় রয়েছে মাত্র ৯টি (মতান্তর ১২-১৪টি)। মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে মাত্র ৩টি, নেই কোনো কলেজ। সরকার সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে অথচ বিভিন্ন জরিপের তথ্যমতে, চা শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সারাদেশে যেখানে ৯৮ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সেখানে চা শ্রমিক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের হার শতকরা ৪৯ শতাংশ। চা বাগানগুলোতে যে কয়টি বিদ্যালয়ে রয়েছে সেখানে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয় না যথাযথ শিক্ষা কারিকুলাম। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির কোনো ব্যবস্থাও নেই সরকার কিংবা বাগান মালিক পক্ষের। সরকারি বইগুলো শিক্ষার্থীরা বিনা পয়সায় পেলেও দেওয়া হয় না উপবৃত্তি, পোশাক বা খাতা। ব্যবস্থা নেই দুপুরের টিফিনেরও। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে চা শ্রমিক শিশুদের। চা বাগান মালিক সমিতির পোষ্য কোটা হিসেবে চা শ্রমিক শিশুদের পড়ালেখার জন্য মাসিক জনপ্রতি বরাদ্দ মাত্র ৪৫ টাকা। যা দিনে গড়ে পড়ে মাত্র দেড় টাকা। মাসিক এই ৪৫ টাকা বরাদ্দে লেখাপড়া করতে পারা তো দুরূহ, কলম, বই-খাতা কিনতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে বাবা-মাদের।

♦ শ্রীমঙ্গল নিকটবর্তী চা বাগানের একজন শিক্ষার্থী প্রবণী'র মা'র অভিব্যক্তি, 'পড়ালেখার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তা দিয়ে কলম, খাতা কিছু কিনে দিতে পারি না। এছাড়া স্কুলের ভর্তি ফিস, পরীক্ষার ফি'র টাকা জোগাড় করতে পারি না। আমাদেরও তো ইচ্ছে করে সন্তানদের লেখাপড়া করাইতে, কিন্তু টাকার অভাবে পারি না। তাই বাধ্য হয়ে সন্তানকে চা বাগানের কাজে নিয়ে আসতে হলো। সে থাকলে আমার রোজকার একটু ভালো হয়। সে ২৫-৩০ কেজি পাতা তুলে দিতে পারে।'

♦ শ্রীমঙ্গল উপজেলার এক চা বাগানের ১২ বছর বয়সী কন্যাশিশু শিউলী মুণ্ডা। অকালে তার মা মৃত্যুবরণ করলে বাবা পুনরায় বিয়ে করেন এবং শিউলী মুণ্ডাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। শিউলী মুণ্ডা বৃদ্ধা দাদির তত্ত্বাবধানে থাকে, দাদি বেলমনি চা বাগানের নিবন্ধিত শ্রমিক; সেহেতু শিউলী মুণ্ডা দাদিকে নিয়ে চা বাগানের চা পাতা উত্তোলনে সাহায্য করছে। শিউলীর কথা হলো– 'আমি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। দাদি বলেছিলেন, তিমি আমার লেখাপড়ার খরচ দিতে পারবেন না। আমি যদি কিছু উপার্জন করতে পারি, তবে পরিবারের জন্যে ভালো হবে।' শিউলী এখন বেলমনিকে তার প্রতিদিনের ২০-২৫ কেজি চা পাতা তুলতে সহায়তা করে।

♦ একই বাগানে ১৬ বছর বয়সী সখিনা মুণ্ডা সপ্তম শ্রেণিতে এসে লেখাপড়া ছেড়ে চা পাতা তোলা শুরু করে। সখিনার কথা, 'এই বাগানের এক নিবন্ধিত কর্মী আমার মা যক্ষ্মায় ভুগছেন। কয়েক বছর আগে আমার বাবা মারা গেছেন। আমাদের চার সদস্যের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য আমাকে এখানে কাজ করতে হয়।' অন্যান্য চা শ্রমিকদের মতো সখিনাও দিনে কমপক্ষে সাত থেকে আট ঘণ্টা কাজ করে।

চা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাল্যবিবাহের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। বাল্যবিবাহের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা যেন রীতিমতো যুদ্ধ, মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়। অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে যুক্ত থেকে অজস্র কন্যাশিশুর আগামী ভবিষ্যৎকে মসৃণ করেছে সুকেশ বাগদি ও বিনতা হাজরা। কতোটুকু দুঃসাহসিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে, সেটি বোঝা যায় দৃষ্টান্ত থেকেই। সুকেশ বাগদি'র ভাষায়, 'বিয়ের মণ্ডপে বওয়াইছে আর আমরা গিয়া জামাইরে তুইল্যা বাড়ি পাঠাই দিছি। পরে পঞ্চায়েতে জানাইছি, সিদ্ধান্ত হইছে ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়স হইলে একসঙ্গে থাকব, এখন না।' বিশেষত যেখানেই বাল্যবিবাহের খবর শোনেন, ছুটি যান দ্রুতগতিতে; দেরি হলেই সর্বনাশ হতে পারে। অত্র এলাকার রামপাড়ায় একটি বাল্যবিবাহের আয়োজন সংবাদ শোনার পর পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় বিয়ে সম্পাদিত হয়। সে বিয়ে বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেও ১৬ বছরের মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়িতে যেতে দেওয়া হয়নি। উপযুক্ত বয়স হলেই মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন অভিভাবকগণ।

সুকেশ বাগদি চা শ্রমিক হলেও আর দশজনের থেকে আলাদা, তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাল্যবিবাহ রোধে পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। কন্যাশিশুদের উত্তক্তকরণে তরুণদেরও আইনের ভীতি দেখাতে সমর্থ্য হয়েছেন। সুকেশের ভাষায়, 'বোনেরা, এলাকার ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে যে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতাম, তখন এই রাস্তায় কোনো গাড়ি চলাচল করত না। যারা আমাদের সঙ্গে যেত না, স্থানীয় বখাটে ছেলেরা মেয়েদের দেখামাত্র ইভটিজিং করত। ছোট ভাই হিসেবে তাদের বললাম, যারা তোমাদের রাস্তায় নানাভাবে হয়রানি করে, তাদের আমাকে দেখিয়ে দাও। ওরা আমাকে দেখিয়ে দেওয়ার পর আমি ওদের বাড়িতে যাই। অভিভাবক, বাগান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি। তাদের বলি, আপনারা ইভটিজিং বন্ধ ও যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থায় যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে ভালো হয়। এখন আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না।' তবে হ্যাঁ, এ কাজ করতে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স'-এর সঙ্গে। এরই সূত্র ধরে বাগানের চৌহদ্দি পেরিয়ে স্থানীয় থানা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস পর্যন্ত পৌঁছেছেন।

সুকেশ ও বিনতা'র সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও নারী শিশু নির্যাতন রোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদল তরুণ। বাল্যবিবাহের সুফল-কুফল সম্পর্কে আলোচনায় ওঠে আসে ভয়ঙ্কর সব চিত্র। অপ্রাপ্ত বয়সে একটি ছেলে বা মেয়ে বিবাহে আবদ্ধ হলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, বাল্যবিবাহ হলে যে কোনো সময় মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হতে পারে। মেয়েটি নিজেই একজন শিশু। সে আরেকটি শিশুকে কীভাবে গর্ভে ধারণ করবে, এর ফলে মা ও শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। বিনতা নিজের বাল্যবিবাহ ভাঙার মাধ্যমে সমাজের এই ব্যাধিকে প্রতিরোধ করে ছোট ছোট মেয়েদের স্বপ্নকে প্রস্ফুটিত

করতে সাহায্য করে চলেছে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সমাজের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রর্দশন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। বিনতা বলেছেন, 'এতো সহজ ছিল না বিয়ে ভাঙা। সেই সময় চা বাগানে বাল্যবিবাহ হতো প্রতি ঘরে ঘরেই। বরং কোনো মেয়েকে বাল্যবিবাহ না দেওয়াটাই ছিল অস্বাভাবিক কিছু।' বাল্যবিবাহ সচেতনতা আলোচনায় কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে অভিভাবকগণও উপস্থিত হয়ে থাকেন।

চা বাগানে ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা ও আত্মহত্যার পরিস্থিতি লোমহর্ষক। বিগত বছরগুলোতে ১২টি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ। সেগুলো হলো– যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন, আত্মহত্যা, অপরাধে সংশ্লিষ্ট শিশু, নিখোঁজ ও পানিতে ডুবে মৃত্যু। এক্ষেত্রে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪২৬; ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৯৪ অর্থাৎ এক বছরে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর হার বেড়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ৯৬ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার, ৩০ শিশু অপহরণ, ৬৮ শিশু নির্যাতন, ৩৩ শিশু নিখোঁজ ও ৯টি শিশুর বিভিন্ন অপরাধে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সত্যিকার অর্থে চা বাগানের কন্যাশিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। সুকেশ বাগদি ও বিনতে হাজরার মতো উদ্যোগী ও উদ্যমী তরুণদের অংশায়নের ক্ষেত্রকে স্বাগত ও উৎসাহিত জানানো দরকার। প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠা যেমন জরুরি, অনুরূপভাবে আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে নাগরিক অধিকারসমূহ প্রাপ্তির জন্যে প্রতিবেশী তথা সবার সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

মো. মোসারফ হোসেন*

কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যঃ স্বপ্ন ও চ্যালেঞ্জ

যখন কন্যাশিশুরা স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত হয়, তখন তারা কেবল নিজেদের নয়, তাদের পরিবার, সমাজ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। কন্যাশিশুরা বাংলাদেশের হৃদয়ে ছোট্ট কোমল হাতের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আলোকবর্তিকা ধারণ করে, যে আলো তাদের স্বপ্নগুলোকে উজ্জ্বল করে। স্বাস্থ্য এমন এক মৌলিক উপাদান যা কন্যাশিশুদের স্বপ্নের পথে অগ্রসর হতে এবং সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে, তা দূর করা কন্যাশিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বপ্নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

পুষ্টিহীনতার চ্যালেঞ্জঃ বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের অন্যতম বড় সমস্যা হলো পুষ্টিহীনতা। বিডিএইচএস-২০২২ অনুযায়ী, ১৫-১৯ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের ৩৪ শতাংশ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এই পুষ্টির অভাব শুধু শারীরিক নয়, বরং মানসিক এবং সামাজিকভাবে তাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাগত অগ্রগতি বাধা পায়। ফলে, তাদের স্বপ্নগুলো যেন ঘনঘোর মেঘে ঢেকে যায়।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও অকাল গর্ভাবস্থাঃ কন্যাশিশুদের প্রজনন স্বাস্থ্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ১৫-১৯ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মধ্যে ৩২ শতাংশ গর্ভাবস্থার সময় বিভিন্ন জটিলতায় ভোগে। এই অকাল গর্ভাবস্থা তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে, জীবনের সুরেলা স্বপ্নকে ম্লান করে। অনেকেই অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ক্ষীণ করে ফেলে।

মানসিক স্বাস্থ্যের অন্ধকারঃ কন্যাশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়।

* প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

২৫ শতাংশ কন্যাশিশু মানসিক সমস্যায় ভুগছে, যার পেছনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং সামাজিক চাপের বড় ভূমিকা রয়েছে। এটি যেন এক নিরেট নিঃসঙ্গতা, যেখানে স্বপ্নের আলো ম্লান হয়ে আসে।

শিশুশ্রম ও গৃহস্থালি শ্রমের ভার: ১২ শতাংশ কন্যাশিশু শিশুশ্রম বা গৃহস্থালি কাজে নিযুক্ত, যা তাদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সীমাবদ্ধতা তাদের স্বপ্নগুলোকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পথে ঠেলে দেয়।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও তার প্রভাব: ১৫-১৯ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মধ্যে ১৭ শতাংশ শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়, যা তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে ভেঙে ফেলে। সহিংসতার এই ছায়া তাদের স্বপ্নগুলোকে তছনছ করে দেয়।

আর্থিক অস্থিতিশীলতা: ২০ শতাংশ কন্যাশিশু গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় না। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা তাদের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে, স্বপ্নগুলোকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

এগিয়ে যাওয়ার উপায়:

দৃষ্টিভঙ্গি: কন্যাশিশুদের সামনের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করার জন্য প্রথমে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কন্যাশিশু নয়, তাদের 'শিশু' হিসেবে দেখতে হবে, এটাই প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের সমাজে কন্যাশিশুরা প্রায়ই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়, যা তাদের মধ্যে অবদমিত অনুভূতির জন্ম দেয়। এই মানসিকতাকে ভাঙতে হবে। নীতি-নির্ধারকদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, কারণ যথাযথ নীতিমালা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সচেতনতা বৃদ্ধি: পরিবার ও সমাজে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এটি কেবল স্বাস্থ্যগত নয়, সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত জরুরি। কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনাগুলোকে গোপন রাখার বদলে, পরিবারে ও বাইরে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা: কন্যাশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সেলরদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা গেলে তারা অনেক বেশি সুরক্ষিত ও সচেতন বোধ করবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার: স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্য অপরিহার্য। দেশে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কমপক্ষে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষকদের

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কন্যাশিশুদের সঠিক স্বাস্থ্য তথ্য দিয়ে গাইড করতে পারেন।

নারী ও কন্যাশিশুবান্ধব সেবা কেন্দ্রঃ প্রত্যেক স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে নারী ও কন্যাশিশুবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেবাদানকারীদের নারী ও শিশুদের প্রয়োজন বুঝে সেবা দেওয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যেন কন্যাশিশুরা এই সেবাকেন্দ্রগুলোকে নিরাপদ মনে করে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ঃ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। যেন এক এলাকায় একই ধরনের প্রকল্প বারবার বাস্তবায়িত না হয় এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রতিটি কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এতে আলাদা কর্মসূচি পরিচালনার চেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর হবে।

পরিশেষে, কন্যাশিশুদের জীবন নানা চ্যালেঞ্জেপূর্ণ হতে পারে, তবে স্বপ্ন দেখা থেমে থাকতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করতে হবে এমনভাবে, যাতে তারা নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে। আমাদের কন্যাশিশুরা তাদের আলোকিত স্বপ্নের পৃথিবীকে দ্যুতিময় করে তুলুক, আলোকিত হোক সারা বিশ্ব।

তথ্যসূত্রঃ

1. Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2022.
2. UNICEF. (2022). The State of the World's Children 2022.
3. UNFPA. (2023). State of World Population 2023.
4. WHO. (2021). World Health Statistics 2021.
5. ILO. (2021). Global Estimates of Child Labour: Results and Trends 2012-2020.
6. UN Women. (2023). The Shadow Pandemic: Violence Against Women and Girls.
7. World Bank. (2022). Bangladesh Economic Update.

মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত*

পারিবারিক সহিংসতা ও শিশুদের ওপর প্রভাব

বর্তমান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ শিশু। ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে ১৮ বছরের নিচে মানুষের মোট জনসংখ্যা ৫ কোটি ৮৯ লাখ ৫৪ হাজার ৯২৭ জন। শিশুদের সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু বাংলাদেশ শিশুদের নিরাপত্তা ও বিকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে অনেক পিছিয়ে আছে।

পারিবারিক সহিংসতা হলো পরিবার বা স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মধ্যে শোষণ/নির্যাতন এবং প্রায়শই এই ধরনের নির্যাতন ঘটে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ২৬৯ জন নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন, যাদের মধ্যে ৮৪ জন স্বামী দ্বারা খুন হন। একইসময়ে ৩৯২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হয়, যাদের মধ্যে ৭৮ জন শিক্ষক দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। উক্ত সময়ে ২৩৯ শিশু হত্যার শিকার হয়, যাদের মধ্যে ৫০ জন আত্মহত্যা করে। এই প্রতিবেদন শুধু বিগত ছয়মাসের, যা প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষকে নাড়া দিবে।

বিংশ শতাব্দীর এমন সময়ে দাঁড়িয়ে একটি দেশের পারিবারিক সহিংসতা, শিক্ষক দ্বারা যৌন নির্যাতন ও শিশু হত্যার মত ঘটনা আমাদের জানিয়ে দেয় আমরা কতটা অনিরাপদ। আমাদের বিবেক কতটা অবিবেকপূর্ণ। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা পারিবারিক সহিংসতা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এটি শিশুদের ক্ষতি করে। এমনকি যখন শিশুরা এ ধরনের শোষণ দেখে না তখনও এর প্রভাব থাকে। এই সহিংসতার জন্য শিশুরা হয়তোবা নিজেদের দায়ী করতে পারে। অসহায় বোধ করতে পারে। খেলাধুলা বা কোনো বন্ধু তৈরির কাজটি কঠিন মনে করতে পারে। চুপচাপ হয়ে যেতে পারে। সবসময় ভয়ে থাকতে পারে। শিশু অনেক বেশি কঠোর ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠতে পারে।

* উন্নয়নকর্মী ও লেখক

পরিবার শিশুদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়, আর বাবা-মা সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাই বাবা-মায়ের কিছু নিয়ম-কানন পালন করা অত্যাবশ্যক। প্রথমত, কীভাবে শিশুর দেখাভাল করবেন তা পরিবারের সবার সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিন। একজন আরেকজনকে ছোট করবেন না। শিশুদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও তাদের চিন্তা-ভাবনাকে সম্মান করুন। সকলে মিলে পরিবারের নিয়মনীতি নিয়ে কাজ করুন। শিশুদের আচরণের একটা সীমারেখা তৈরি করুন। সেই সীমারেখা যেন শিশুর বয়স ও বোঝার ধরনের ওপর চাপ তৈরি না করে তা নিশ্চিত করুন। শিশুর দেখাভাল করা এবং তাদের জন্য একজন রোল মডেল হিসেবে আচরণ করা বাবা-মা দু'জনেরই দায়িত্ব। সুতরাং একে অপরকে সহযোগিতা করুন। গেমস বা অন্যান্য খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান এবং তারা যে কাজটি পছন্দ করে তাতে উৎসাহ দিন।

মূলত বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। মানুষের শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে সেকেলে চিন্তা-ভাবনা বিরাজমান। যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে কমলমতি শিশুর ওপর। সমাজের অনেক প্রাচীন মতবাদ যা জাতীয় আইনকেও হার মানায় যেমন, শনিবার জন্ম নেওয়া শিশুর কপাল খারাপ, ছেলে শিশু বংশের প্রদীপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে শিশুদের উন্নয়ন নিয়ে পাঠ্যক্রম ও প্রচারণা অপ্রতুল, আর যেটুকু আছে তা শুধু দায়সারা।

অতীব দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বাংলদেশের বিভিন্ন সময়ের সরকার মুখে মুখে অনেক কিছু বললেও বাস্তবে শিশু অধিকার নিয়ে অনেক কম কাজ করেছে। তবে এ কথা সত্য বিভিন্ন দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থা শিশু অধিকার নিয়ে অনেক অবদান রাখছে।

শিশুদের সত্যিকারের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সমাজ ও দেশের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারকে শিশুবান্ধব করতে বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে।

সহিংসতার শিকার শিশুর প্রতি সহনশীল আচরণ আচরণ করতে হবে এবং আইনি সহায়তা প্রদান করতে হবে। শিশুর সঙ্গে অমানবিক আচরণ হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবগত করতে হবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতন করতে হবে। প্রয়োজনে শিশু অধিকার নামে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন খোলা যেতে পারে।

শিশুদের বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিলে শিশু ভালোভাবে বেড়ে ওঠবে। তবেই আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ পাব বলে আশা করতে পারি।

মৌসুমী শারমিন*

সমাজের মনস্তত্ত্ব কন্যাশিশুর অগ্রযাত্রায় অন্তরায়

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার মায়েরা আজকাল পুত্র ও কন্যাশিশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য করেন না। খাবার বা পড়ালেখার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সমান গুরুত্ব দেন– এমনটিই আজকাল শোনা যায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে আলোচনায়। তাহলে কেন মর্যাদাপূর্ণ একটি জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের? আর কেনইবা বাংলাদেশে শিশুবিবাহের হার সর্বোচ্চ?

২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিহারে লিঙ্গ বৈষম্য কমেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির হার বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গ অনুপাতে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। এখন প্রায় ২০.৮ শতাংশ নারী এবং ২৪.৮ শতাংশ পুরুষ উচ্চশিক্ষায় আছেন। এখানে আবার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। শৈশর থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে মেয়েদের পিছিয়ে থাকা, পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ না পাওয়া, চরাঞ্চল বা অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চ বিদ্যালয় না থাকা, মানসম্পন্ন শিক্ষক না থাকা, শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অনুপাত ঠিক না থাকা, দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পরিবহনের ব্যয়ভার বহন করতে না পারা এগুলো সবই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। আবার শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেক শিশু এই সুযোগের বাইরে। তা সে পরিবারে থাকা শিশু হোক কিংবা পথবাসী। অথচ সঠিক শিক্ষা জীবনকে এবং দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রকে বদলে দিতে পারত।

* জেন্ডার কো-অর্ডিনেটর, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও যৌন হয়রানি একটি গুরুতর সমস্যা। এ কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে যেমন বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি কন্যাসন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে অভিভাবকও দুশ্চিন্তায় থাকেন। যৌন হয়রানির শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিক ক্ষতিও অনেক। অনেক ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কা অস্থিরতা তৈরি করে এবং এই ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য নানারকম প্রস্তুতি নিয়ে অনেক কন্যাশিশু, কিশোরীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। ২০০৯ হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যে অভিযোগ কমিটি থাকার কথা, তারও বাস্তবায়ন প্রায় নেই। এসব কিছুই শিশু সুরক্ষা কনভেনশন অনুসারে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৬৩.৫১ শতাংশ নারী অনলাইনে সহিংসতার শিকার হন। আরেকটি গবেষণায় ৮৭ শতাংশ নারী অন্তত একবার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এ সকল পরিসংখ্যানের বাইরে ঘরে পরিচিতজন কিংবা জনপরিসরেও অনেক ঘটনা ঘটে, প্রায়ই যা প্রকাশিত হয় না।

আমাদের দেশে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানেও একটা ঘাটতি দেখা যায়, শহর কিংবা প্রত্যন্ত এলাকা, সর্বত্রই চিত্র মোটামুটি একই। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে অনেকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। অথচ সঠিক তথ্য না জানার ফলে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং নেতিবাচক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় কন্যাশিশুকে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু এবং এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যাশিশু। এ বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের জীবনদক্ষতার বিকাশের জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ সবইতো হাতেগোণা। আর নয়ত তা শহরমুখী। দরিদ্র পরিবারগুলোর সেখানে প্রবেশাধিকারই নেই। অথচ দেশের সত্যিকার উন্নয়নের জন্য সকল শিশুরই বিকাশ প্রয়োজন। উপযুক্ত খেলার মাঠ, কন্যাশিশুদের কথা বলার মতো জায়গা, পরিবারে বা বাইরে বিকশিত হওয়ার মতো পরিবেশ না দিয়ে কী করে তাদের আত্মমর্যাদাশীল করে তৈরি করা সম্ভব? খেলাধুলায় নারীদের নানা অগ্রযাত্রা কন্যাশিশুদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং জেন্ডার রোল সম্পর্কে সমাজের ধারণার পরিবর্তন এক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন।

মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি ও বৃত্তি চালু আছে, অপর্যাপ্ত হলেও হোস্টেল সুবিধা আছে, কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ আছে। সরকারের বিভিন্ন হেল্পলাইন আছে, যেখানে ২৪/৭ সেবা পাওয়ার কথা। নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন এবং বিধান আছে। শিশু অধিকার সনদও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। তারপরও কেন বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার এখনও বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ? ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী, ৫১.৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

সংখ্যক কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৫ বছরেরও আগে। পূর্বের তুলনায় এ হার কমলেও বিদ্যমান হারও উদ্বেগজনক। এবং এসব কিছুকে শুধু সংখ্যা দিয়ে বিচার করে প্রতিটি ঘটনার যে ক্ষয়ক্ষতি তা নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

মোসা. রাজিয়া খাতুনের গল্প তো সবার জানা। অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় নারীদল ফুলবলে নানা কৃতিত্ব যার দখলে ছিল। অথচ এ বছরেই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁকে। এ ঘটনা শুধু বাল্যবিয়ে এবং এর পরিণতিকেই তুলে ধরে না, পরিবারের কন্যাসন্তানের ব্যক্তিসত্তার মূল্যায়নের চিত্র, পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোয় কন্যাশিশুর অসহায়ত্ব, সমাজের নারী-পুরুষের ক্ষমতার অসমতা, এবং গভীর জেন্ডার বৈষম্য চিত্রও প্রকাশ করে।

সমাজে নারী এবং কন্যাশিশুকে দেখার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে বাল্যবিয়ে হ্রাস বা নির্মূল করা সম্ভব নয়। বাল্যবিয়ে সংঘটনের ক্ষেত্রে কে, কেন, কী চিন্তা থেকে কাজটি করছে তার গোড়ার মনস্তত্ব সম্পর্কে জানতে এবং বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনে এর পরিবর্তনে কাজ করতে হবে। বাল্যবিয়েকে অনেক পরিবার মেয়েদের যৌন হয়রানি থেকে বাঁচানোর একটা পথ হিসেবে দেখেন। অনেকে মনে করেন, কন্যার বয়স অল্প থাকতে ভালোয় ভালোয় যোগ্য পাত্রের কাছে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, পিতা-মাতা হিসেবে বোঝা কমাবেন। ধর্মীয় ও সামাজিক চাপের কথাও বলেন অনেকে। এমনও দেখা যায়, উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে, ধার-কর্য করে মেয়ের বিয়ের যৌতুক বা বিয়ের খরচ যোগাচ্ছেন বাবা-মা, অথচ দারিদ্র্যকে বাল্যবিয়ের অজুহাত হিসেবে তুলে ধরছেন।

বিবিএস সূত্র অনুসারে, বাংলাদেশে ২০ থেকে ২৪ বয়সী নারীর মধ্যে, ১৮ বছরের আগে বিয়ে করার হার ২০২২ সালে ৪০.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৪১.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৫ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে করা শিশুর সংখ্যা ২০২২ সালে ৬.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৮.২ শতাংশে পৌঁছেছে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ২০-২৪ বয়সী নারীদের মধ্যে ২৪.২ শতাংশ নারী ১৮ বছর হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন। বিয়ের ন্যূনতম বয়স বা বাল্যবিয়ে যে অপরাধ সে সম্পর্কে জানেন না, এমন মানুষের সংখ্যা কমেছে। কিন্ত বিয়েকেই মেয়েদের নিরাপত্তা হিসেবে দেখা, অবশ্য কর্তব্য হিসেবে মনে করা, কন্যাশিশুকে অধঃস্তন হিসেবে দেখার তেমন পরিবর্তন হয়েছে কই? কন্যাশিশুদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না দেওয়ার যে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি তার দায় শুধু পরিবারের নয়, রাষ্ট্রের পুরো কাঠামোর।

একটি বেসরকারি, আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা হিসেবে কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড চরম দারিদ্র্য পুরোপুরি নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করছে। যেখানে সকলের জন্য সম্মানজনক

জীবনযাত্রার মান, দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর এবং সৃজনশীল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও পছন্দের অধিকার থাকবে। এমন একটা বিশ্ব নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে কনসার্ন জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, শিক্ষা সচেতনতা, জরুরি সহায়তা, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু এবং পরিবেশ নিয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করছে। কনসার্ন মনে করে, দারিদ্র্য নিরসন করতে হলে জেন্ডার বৈষম্য এবং অসমতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই সকল কার্যক্রমে জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করছে কনসার্ন। জেন্ডার ট্রান্সফরমেশন বলতে সংক্ষেপে বোঝায়, নারী-পুরুষ বা সকল জেন্ডারের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈষম্যের মূল কারণকে চিহ্নিত করা, জেন্ডার সম্পর্কিত প্রচলিত মনোভাব, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণকে চিহ্নিত করা। সামাজিকভাবে বা সংস্কৃতিগতভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকা, অসম ক্ষমতার সম্পর্ককে চিহ্নিত করা। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ, পরিবারে এবং সমাজের সকল স্তরে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক রূপান্তরে কাজ করা। পুরো প্রক্রিয়ায় পুরুষ এবং বালকদের সম্পৃক্ত করা।

কনসার্ন অধিকাংশক্ষেত্রে পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে। এবং পরিবারের সকল সদস্যের বিশেষত শিশুদের সুরক্ষায় সচেতন থেকে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। ছেলে এবং কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্যারেন্টিং সেশন, ব্যক্তিগত কিংবা গ্রুপ কাউন্সেলিংও পরিচালনা করে। শিশুদের শিক্ষা, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা, ব্যক্তিগত জীবন দক্ষতা, আইন সচেতনতা এবং অধিকার, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছে। স্টেকহোল্ডার ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে, ধর্মীয় নেতা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল বা মাদরাসা সকলের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এসব কিছুরই উদ্দেশ্য এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করা যেখানে সবাই জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবেন। কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সচেতন পরিকল্পনা দরকার–

- কিশোরী মেয়েদের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সম্পর্কিত শিক্ষা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- পুরুষ এবং বালকদের সম্পৃক্ত করে নেতিবাচক পুরুষালি আচরণের পরিবর্তন;
- পিতা-মাতাকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- কমিউনিটিতে জেন্ডার সমতা ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় আইনি সেবা ও সহায়তার উন্নয়ন;
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন;
- নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন;
- জেন্ডার এবং অধিকার সম্পর্কে সকলের ধারণার স্বচ্ছতা তৈরি;
- শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম ভবিষ্যৎ উপযোগী করা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- গণমাধ্যমকে শিশুর মানস গঠনের লক্ষ্যে উপযুক্ত করা;
- সেবা ও সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত সকলকে জেন্ডার সমতা সম্পর্কে বিশ্বাস;
- সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু।

রঞ্জনা বিশ্বাস*

ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মিডিয়া পুঁজিবাদের হাতকে শক্ত করার পাশাপাশি সমাজে পরোক্ষভাবে রেপ কালচারকে উসকে দিচ্ছে। মিডিয়া সমাজের ভেতরে শরীর ও যৌনতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে রেপের একটি কম্পালসিভ সংস্কৃতি জন্ম দেয়, যাতে করে মানুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত কামোত্তেজনা তৈরি হয়, আর তার প্রতিক্রিয়ায় ধর্ষণ সংঘটিত হয়। তবে ভারতে, এর প্রভাব মারাত্মক।

যখন কোনো সমাজে বস্তুগত উপাদানের (মিডিয়ার ক্ষেত্রে পর্নো, নাইটক্লাব, বার, রেটেড মুভি, যৌনতার কিটস) সঙ্গে অবস্তুগত উপাদানের (মিডিয়ার ক্ষেত্রে, মানুষের সঠিক যৌন ধারণা, বয়স ও অবস্থানভেদে বিভিন্ন যৌন বস্তুর প্রদর্শন, তার প্রসার ইত্যাদি) বিকাশ সমানভাবে হয় না, তখন সেখানে একটি সংকট সৃষ্টি হয়, যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা কালচারাল ল্যাগ বা সাংস্কৃতিক দূরত্ব বলেন। এই দূরত্ব মিডিয়ার রোল প্লেয়িং এর মাধ্যমেও হয়, যা সমাজে ধর্ষণের সংস্কৃতি উৎপাদন করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, 'পর্নোগ্রাফি যদি হয় তত্ত্ব, ধর্ষণ হলো তার প্রয়োগ ও অনুশীলন। আদতে তা-ই ঘটে থাকে।' পর্নোগ্রাফির আগ্রাসী যৌনতা পুরুষের মনস্তত্ত্বে নারী প্রসঙ্গে এবং নারী-পুরুষের যৌন-সম্পর্ক বিষয়ে ভুল বার্তা প্রেরণ করে। এ কারণে যে কাউকে ভোগ্য মনে করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজে পৌরুষের ধারণা। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে পুরুষ, পুরুষত্ব, পৌরুষ ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বিদ্যমান। যৌন-আধিপত্য বিস্তার করা, নারীকে দখল করতে পারা পৌরুষ বা পুরুষত্বের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তাই নারীর 'গায়ে হাত দেওয়া', 'ধস্তাধস্তি করা', 'কুপ্রস্তাব'' দেওয়া এগুলো অনেবে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়। পুরুষের মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় পৌরুষের ধারণা। নারীকে কবজা করা পৌরুষের ব্যাপার বলে মনে করে ধর্ষক। এদিকে ধর্ষকামী মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা সাইকোপ্যাথের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে,

* কবি ও গবেষক

সাইকোপ্যাথদের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা বেশি; তারা অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। অন্য অপরাধগুলোর মতো করে যৌন অপরাধকেও সাইকোপ্যাথরা অপরাধ মনে করে না।

আমেরিকান বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এ. নিকোলাস গ্রোথ ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। একে গ্রোথ টাইপোলজি বলা হয়। এই তিনটি ভাগ হচ্ছে–

১. Power rapist (পাওয়ার রেপিস্ট)

পাওয়ার রেপিস্টরা নিজেদের সব থেকে ক্ষমতাবান হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। তারা সবসময় ক্ষমতাকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যক্তিজীবনে তারা সবসময় ক্ষমতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে। ক্ষমতার ফ্যান্টাসিতে থেকে তারা ধর্ষণের মতো কঠিন অপরাধ করে এবং সেই অপরাধ তারা ক্ষমতা ব্যবহার করে ঢেকে ফেলতে চায়।

২. Anger rapist (অ্যাঙ্গার রেপিস্ট)

এ ধরনের ধর্ষকরা সাধারণত ক্রোধী। সর্বাবস্থায় এরা রাগকে ধর্ষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এরা সব সময় হিংসাত্মক ও প্রতিশোধপরায়ণ।

৩. Sadistic rapist (স্যাডিস্টিক রেপিস্ট)

এ ধরনের ধর্ষকরা ধর্ষণের পর ভিকটিমের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। ভিকটিম বা ধর্ষিতাকে কষ্ট দেওয়ার মাঝে তারা এক ধরনের পাশবিক সুখ খুঁজে পায়।

ধর্ষকদের নিয়ে আমেরিকার আইন এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এফবিআই (Federal Bureau of Investigation) দীর্ঘদিন গবেষণা করছে। তাদের বিশেষজ্ঞরা ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা ধর্ষকদের টেস্টোস্টেরন (testosterone ev male hormone) পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ধর্ষকরা অতিমাত্রায় সেক্সি–এই রকম ধারণা ভুল। বরং বেশিরভাগ ধর্ষকই আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে, অনেকেই ধ্বজভঙ্গ বা ইরেকটাইল ডিসফাংশন (erectile dysfunction) এ ভোগে, বেশিরভাগ ধর্ষকরাই নিজের যৌনজীবন নিয়ে হতাশ। এফবিআই তাদের গবেষণা দেখিয়েছেন ধর্ষক হচ্ছে **চার রকমের যথা:** 1. Sadistic (ধর্ষকামী); 2. Anger Retaliatory (ক্রুদ্ধ প্রতিশোধপ্রবণ); 3. Power Assertive (ক্ষমতার দাপটপ্রবণ); 4. Power Reassurance (ক্ষমতায় আশ্বস্ত)।

Sadistic ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হলে আগে স্যাডিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার সম্পর্কে জানতে হবে। স্যাডিস্টিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা বারবার সহিংসতা, আগ্রাসন এবং নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা

অন্যদের ওপর যে কোনোভাবে যে নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। এজন্য তারা যেকোনো ধরনের সহিংসতা প্রদর্শন করে থাকে। যখন অন্যরা তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে না চায়, তখনই তারা তাদের আচরণে সহিংসতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অনেক স্যাডিস্ট শারীরিকভাবে নির্যাতন না করলেও মৌখিকভাবে বা মানসিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভয় দেখায় বা অন্যদের লজ্জা দেওয়া এবং অপমানিত করে থাকে। এই ব্যাধিটি শৈশবের মানসিক আঘাত থেকে শুরু হয়ে থাকে। এরা এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠে, যেখানে একজন নারীকে নির্যাতন করা হয়। স্যাডিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে। গবেষকগণ এদের মোট পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে শনাক্ত করার সুযোগ পেয়েছেন–

১. তারা সবসময় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শারীরিক নিষ্ঠুরতা বা সহিংসতা ছড়িয়ে থাকে। ব্যবহার করেছে (শুধু কিছু অ-ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়, যেমন কাউকে ছিনতাই করার জন্য আঘাত করা)।
২. অন্যের উপস্থিতিতে লোকেদের অপমান বা অবজ্ঞা করে। আক্রান্ত ব্যক্তি তার নিয়ন্ত্রণে থাকা কারো সঙ্গে অস্বাভাবিক কঠোর আচরণ করে বা শাসন করে।
৩. অন্যদের (প্রাণী-সহ) মানসিক বা শারীরিক কষ্ট দিয়ে আনন্দিত হয় বা আনন্দ পায়।
৪. অন্যদের ক্ষতি করা, কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যা বলে।
৫. অন্য লোকেদের ভয় দেখিয়ে (এমনকি সন্ত্রাসের মাধ্যমে) সে যা চায়, তাই করতে বাধ্য করে। যাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাদের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে চায়। যেমন, তারা স্ত্রীকে সঙ্গী ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না বা কিশোরী কন্যাকে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি দেবে না।

তবে গবেষকগণ বলেন যে, এই ব্যাধিটা সব সময় যৌন স্যাডিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত হবে না। অযৌক্তিকভাবে তা করা হলে সেটি ধর্ষকের অপরাধকে বৈধ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। তবে শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপরাধীদের প্রতি মানবিক মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিও আমাদের দেওয়া উচিত। আর সেজন্য এই ডিজঅর্ডারের সঙ্গে অপরাধীর ইতিহাস খতিয়ে দেখে তার কাউন্সিলিং করা উচিত।

গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, Sadistic ধর্ষকরা যৌন আনন্দ লাভ করার জন্য কিন্তু ধর্ষণ করে না। সে ধর্ষণ করে ভিকটিমকে অত্যাচার করার জন্য। সে মূলত ভিকটিমের সাফারিং/যন্ত্রণা/হিউমিলিয়েশান উপভোগ করে। এই ধরনের ধর্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ভিকটিমকে ধর্ষণের পরে হত্যা করে চরম যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ লাভ করে। যে সব ধর্ষকরা ভিকটিমকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, হাত-পা, স্তন, যোনিপথ কেটে ফেলে, তাদের একটা বড় অংশই স্যাডিস্টিক ধর্ষক। গবেষণায় দেখা গেছে, Sadistic ধর্ষকের সংখ্যা পৃথিবীর মোট ধর্ষকদের ৪ বা ৫ শতাংশ।

প্রতিশোধমূলক ক্রোধ হলো অ্যাঙ্গার ডিজঅর্ডারের একটি রূপ, যা কারো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করে। এরা বিরক্তি ও হতাশা থেকে কারো প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সাধারণত মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ, অ্যালকোহল বা ড্রাগের অত্যধিক ব্যবহার, ক্লান্তির কারণে আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারালে মানুষ এই ধরনের আচরণ করে থাকে। এছাড়াও এই রোগের কিছু অন্তর্নিহিত মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে থাকতে পারে– হতাশা বা বিষণ্নতা, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, যেমন, অবসেসিভ কমপালসিভ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বা নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের মতো কারণ। গবেষকরা দেখেছেন এই সমস্যায় আক্রান্তদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি।

Anger Retaliator রেপিস্টরা যৌন আনন্দের আশায় ধর্ষণ করে না। এই ধরনের ধর্ষকদের বেশিরভাগেরই নিজেদের শৈশবে নির্যাতনের শিকার হওয়ার ইতিহাস আছে। এরা বেশিরভাগই ছোটবেলায় মায়ের হাতে বা দাদির হাতে বা চাচি বা বড় বোনের হাতে প্রচণ্ড মারধরের বা নির্যাতনের শিকার হয়েছিল (childhood abuse by mother or mother figure women)। সেই থেকে এরা নিজের অবচেতন মনে পৃথিবীর সকল নারীর প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং বিদ্বেষ লালন করে। এরা মূলত দীর্ঘদিনের রাগ/বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য ধর্ষণ করে থাকে। প্রতিশোধ নেওয়ার একজনের অপরাধের জন্য তারা অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার মতন বিকৃত আনন্দ পেতে এরা ধর্ষণ করে। এই প্রকারের ধর্ষকরাও তাদের ভিকটিমের সাফারিং/অপমান/যন্ত্রণা উপভোগ করে প্রতিশোধের আনন্দ পায়। এদের সংখ্যাও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে Power Assertive ধর্ষক। এরা মূলত ধর্ষণ করে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করার জন্য। নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করার বিকৃত উপায় হচ্ছে অন্যকে অপমান করা। এরা মনে করে নিজেকে ক্ষমতাবান প্রমাণ করার জন্য ধর্ষণ করা হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট পন্থা (They rape because that's how they feel that they are powerful, that they can rape or do whatever they want to) এদের চলাফেরায় অতিরিক্ত হামবড়া ভাব আছে, অতিরিক্ত পৌরুষ দেখানোর প্রবণতা থাকে। এরা সব সময় দলবেঁধে (Gang) চলাফেরা করে থাকে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এরা প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তাহীনতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইম্পালসিভ (Impulsive) স্বভাবের অর্থাৎ মাথামোটা এবং গোয়ার প্রকৃতির। ফলে তারা আগুপিছু না ভেবেই কাজ করে ফেলে। এরা মূলত নিম্ন বুদ্ধিমত্তার মানুষ হয়ে থাকে। এই সব পুরুষেরা যখন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে, তখন তারা বন্ধুর হাতে প্রয়োজনের চেয়ে জোরে চাপ দেয়, আবার 'কিরে দোস্ত কেমন আছিস?' বলে বন্ধুর পিঠে চাপড় দেওয়ার সময় জোরে চাপড় দেয়। এরা সাধারণত স্কুলে বা কলেজে বা ভার্সিটিতে প্রতিনিয়ত তারচেয়ে দুর্বলদের পেছনে লেগে থাকে। এই ধরনের তরুণেরা

অধিকাংশক্ষেত্রেই সিরিয়াল রেপিস্ট বা সিরিয়াল নির্যাতনকারী হয়ে থাকে। কিছুদিন পরপর কোনো নারী বা শিশু বা দুর্বল ব্যক্তিকে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন বা অপমান-অপদস্থ না করতে পারলে এদের নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাবান মনে হয় না। তবে Power Assertive ধর্ষকদের সংখ্যা মোট ধর্ষকের ১০ শতাংশের বেশি না।

প্রায় ৭৫ শতাংশ ধর্ষকই হচ্ছে Power Reassurance টাইপের ধর্ষক। এরা মূলত নিজের পৌরুষ নিয়ে আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগে থাকে। গবেষকরা জানান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। হয়তো ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠী মেয়েরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত কিংবা তাকে অবহেলা করত। প্রধানত দুটি ভ্রান্ত ধারণায় (illusion) সে ভুগতে থাকে।
১. আমি আসলে যোগ্য এবং পুরুষালী (manly), মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হয়তো যথেষ্ট পুরুষালী বা আকর্ষণীয় নই, তবে সুযোগ পেলে একদিন দেখিয়ে দিতাম।
২. মেয়েরা মুখে যতই না বলুক, একবার মেয়েদেরকে কাবু করতে পারলে তারা আসলে ধর্ষণ উপভোগই করবে।

অর্থাৎ এই ধরনের ধর্ষকরা মূলত নিজের পৌরুষ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে কোনো নারীকে ধর্ষণ করে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চায়, নিজেকে সুপার ডুপার, ম্যাসকুলিন এবং তেজস্বী হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। সে মূলত নিজের কাছেই এটা জাহির করতে চায়। সে আশ্বস্ত (reassure) হতে চায় নিজের কাছে। এইজন্য এই ধরনের ধর্ষকদের নাম power reassurance। এই ধরনের রেপিস্টরা আক্রমণ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভিকটিমকে। এদের টার্গেট হয় বাসার কাজের মেয়ে, গার্মেন্টস কর্মী, দুর্বল পথচারী, প্রতিবন্ধী নারী, নিজের বাসার ভাড়াটিয়া, অফিসের অধস্তন, প্রবাসীর স্ত্রী, নিজের ছাত্রী, ভিখিরি বা ভাসমান নারী এবং কম বয়সী শিশু বা ভালনারেবল ভিকটিম।

অনেকেই ধারণা করেন, অশিক্ষিত বা দরিদ্র শ্রেণির লোকই এই ধরনের রেপিস্ট হয়ে থাকেন। এটা একদমই সত্য নয়। একজন শিক্ষিত, সচ্ছল, কর্মজীবনে সফল অফিসের বস ব্যক্তিও নিজের পৌরুষ নিয়ে আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগতে পারেন এবং পরিবেশ পেলে এই ধরনের অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হতে পারেন। গবেষণায় এই ধরনের রেপিস্টদেরও সিরিয়াল রেপিস্ট হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

ভারতের অপরাধবিজ্ঞানী মধুমিতা পান্ডে। হালে তিনি ধর্ষকদের নিয়ে কাজ করে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছেন।

২০১২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ডাক্তারি পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়। সেই আলোচিত ঘটনায় ভিক্টিমের ছদ্মনাম নাম দেওয়া হয় নির্ভয়া। নির্ভয়ার ধর্ষণে পুরো ভারত উত্তাল হয়ে ওঠেছিল। এরপর মধুমিতা পান্ডে ২০১৩ সালে নয়াদিল্লির তিহার

কারাগারে থাকা ধর্ষকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন কারাগারে ঘুরে তিনি ১০০ জন ধর্ষকের সাক্ষাৎকার নেন।

২০১৮ সালের আগস্টে ফার্স্টপোস্ট অনলাইন ম্যাগাজিনে মধুমিতা পান্ডের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এ সাক্ষাৎকারে মধুমিতা পান্ডে ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেন। মধুমিতা বলেন, 'ধর্ষণকারীদের পশু বলা, জানোয়ার বলা, দানব বলা সমস্যার সমাধান নয়। তাতে আমরা সমাজের ভালো মানুষ, আমরা ধর্ষণের জন্য দায়ী নই, আর ওরা হলো জন্তু-জানোয়ার, ওরা দায়ী– এ রকম একটা সহজ দায়মুক্তির ধারণা চলে আসে। ধর্ষণ একটা লম্বা সুতা, যার এক প্রান্তে আছে ধর্ষণ নামের ক্রিয়াটি। কিন্তু এটা শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে। নারীকে অধস্তন হিসেবে দেখা, ইভটিজিং, নারীবিদ্বেষী কৌতুক, নারীকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলা, হয়রানি– এসব কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই শেষমেশ ধর্ষণে গিয়ে পৌঁছায়।'

মধুমিতা পান্ডে তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি যখন গবেষণার কাজে গিয়েছিলাম, তখন ধর্ষকদের অস্বাভাবিক ও বিকৃত মনের মানুষ ভেবেই গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, তারা অস্বাভাবিক নন। রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক মানুষ। তবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ ও নিজস্ব বোধের কারণেই তারা এসব করেন।'

মধুমিতা পান্ডে জানান, 'ধর্ষণের দায়ে কারাগারে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বললে হতাশ হতে হয়। তাদের জন্য কষ্টও হতে পারে। একজন নারী হিসেবে ধর্ষকদের জন্য কষ্ট পাওয়া মোটেও উচিত নয়। কথা বলতে বলতে ভুলে গেয়েছিলাম যে, তারা কোনো নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক। কথা বলে জেনেছি, ধর্ষণের কারণে একজন নারীর কী হতে পারে, তা তারা জানেন না। তারা জানেন না ধর্ষণ মানে কী। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করাকে কী বলে, তাও জানা নেই তাদের।...সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কেউ কেউ ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, সেখানে ধর্ষণের মতো কিছুই ঘটেনি। ১০০ জনের মধ্যে মাত্র তিন-চারজন বলেছেন, তারা অনুতপ্ত। অন্যদের কেউ ওই নারীর দোষ দিয়েছেন আর কেউ বা নিজের কাজকে সঠিক বলে জাহির করার চেষ্টা করেছেন। ...ধর্ষণের দায়ে কারাগারে থাকা ৪৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি যা জানিয়েছেন তা অপ্রত্যাশিত। পাঁচ বছর বয়সী এক মেয়েকে ধর্ষণ করায় তিনি খুব অনুতপ্ত। ওই ব্যক্তি বলেছেন, আমি খুবই অনুতপ্ত, আমি তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছি। সে এখন আর কুমারী নেই, কেউ তাকে বিয়েও করতে চাইবে না। আমি যদি কারাগার থেকে ছাড়া পাই, তাহলে ওই মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলব।'

মধুমিতা পান্ডের গবেষণাটি ভারতের ধর্ষকদের ওপর করা হলেও এটা দিয়ে বাংলাদেশের ধর্ষকদের মনস্তত্ত্বের ধারণা পাওয়া কঠিন নয়। কারণ ভারত এবং বাংলাদেশের মানুষ অনেকটাই অভিন্ন সংস্কৃতির অধীন। একই ধরনের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভেতর

থেকে ওঠে আসা দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ মাত্র তারা। তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ প্রতিবেশ একই। পান্ডের এই বক্তব্য কিন্তু সিমোন দ্য বোভেয়ারের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। তবে কোনো গবেষকই ধর্ষণের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপাত্ত পাননি। তবু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সবসময় মুখিয়ে থাকে নারীকে দোষারোপ করার জন্য, তার কৌমার্য হারানোর জন্য তাকেই দায়ী করা হয়। শুধু তাই নয়, আদারত থেকে শুরু করে ভিক্টিম ব্লেইমিং-এর শিকার হন নারী।

রহিমা আক্তার মৌ*

কন্যারা হাসলে হাসে বিশ্ব

১৫/১৬ বছর বয়সী হৈমন্তী ওর একমাসের নবজাতককে কোলে নিয়ে আসে। একবছর আগেও হৈমন্তী ছিল একটা কিশোরী, কাজ করত নিলুদের বাসা-সহ কয়েকটি বাসায়। বছর ঘুরতেই হৈমন্তী আজ এক সন্তানের মা। নিলু ওর মা রাহেলা আর হৈমন্তী বসে নবজাতককে নিয়ে গল্প করছে।

–কিরে হৈমন্তী বাসায় সবাই বাবুকে পেয়ে অনেক খুশি। রাহেলার কথা।

–খুশি হইব না খালা, পোলা হইছে যে। মাইয়া হইলে এতো খুশি হইতো না।

হৈমন্তী অনেক কিছু বুঝে এখন। পুত্রসন্তানের মা হয়েছে বলে পরিবারের ওর কদর বেড়েছে। অথচ সে নিজেই একটা কন্যাশিশু।

কথাগুলো বাড়বে বলে রাহেলা অন্য আলোচনায় চলে যায়। নিলুরা দুই বোন নিলু ছোট, কন্যার পরে কন্যার জন্ম। রাহেলা পরিবারের দ্বিতীয় কন্যাসন্তান। সেখানেও কন্যার পরে কন্যা হয়ে জন্ম নেয়। রাহেলার ছেলেসন্তান হয়নি বলে ওর বাবা আবার বিয়ে করেছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। রাহেলার দুই ভাই হলেও ওর বাবার পরের সংসারে এক হালি কন্যাসন্তানের জন্ম।

নিলু কন্যার পর কন্যা হওয়ায় পরিবারে কারোই কোনো আফসোস নেই। পুত্র বা কন্যা নয়, সন্তান হিসেবেই ওরা বড় হচ্ছে। রাহেলাকে কেউ সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করলে ও বলে,'আমার দুই কন্যা'। অধিকাংশ সময় সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন আসে– 'ছেলে নেই?' কিছুটা বিরক্ত হয়েই রাহেলা জবাব দেয়– 'ছেলে থাকলে তো বলতাম, বলেছি দুই মেয়ে, আমার তাহলে আবার ছেলের কথা কেনো?'

এমন করে বললে প্রশ্নকর্তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। অথচ এই প্রশ্নকর্তাদের মাঝে ৯০ শতাংশই হলো নারী। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন প্রশ্ন করা হয়তো নারীদের চারিত্রিক

* সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

অভ্যাস। হৈমন্তীর ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়ে রাহেলা বলেন, 'জমা করিস ছেলের জন্যে।'

আমাদের সমাজব্যবস্থার সামান্য একটা উদাহরণ দেওয়া হলো উপরে। সমাজে বা পরিবারে কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুর মাঝে যেনো ভেদাভেদ না থাকে, কন্যাশিশু যেনো বৈষম্যের শিকার না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের আদেশ জারি করে। সেখানে বলা হয়, ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ৫ অক্টোরের মধ্যে একটি দিন জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালিত হবে। সেভাবেই প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এবার জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হলো– 'কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ।'

'বিশ্বজুড়ে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নৃশংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু, যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। আর শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যাশিশু, যাদের পেছনে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কন্যা-জায়া-জননীর বাইরেও কন্যাশিশুর বৃহৎ জগত রয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ছাড়াও পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এজন্য কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বেড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কন্যাশিশু সুরক্ষা পেলে সব বৈষম্য দূর হবে।' (তথ্যসূত্র: ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

কন্যাশিশুর সুরক্ষা, শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য রোধ, নির্যাতন থেকে রক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করার প্রত্যয় নিয়ে কন্যাশিশু দিবসের যাত্রা শুরু। অথচ বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। ২০২৪ সালে এসেও কন্যাশিশুর শিক্ষা, সুরক্ষা ও অধিকার জড়সড় হয়ে ঝুলছে। কন্যাশিশু দিবস নিয়ে লেখাটা মাঝপথে ঠিক তখনি চারটি কন্যার আগমন আমার বাসায়। সবার বয়স ১৩ কি ১৪ বছর হবে। চারজনের মাঝে একজনের বিয়ে আগামীকাল। একজন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে একটা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। বাকি দু'জনের লেখাপড়া বন্ধ। ওরা শুধু দেশের রাজধানীতে নয়, রাজধানীর মেরুদণ্ডে বসবাস করে। কিন্তু এই বয়সে লেখাপড়া বন্ধ শুনে চমকে উঠি আমি। অতঃপর জানতে পারি ওরা সবাই তেজগাঁও এলাকার একটা বিশেষ স্কুলে পড়তো। সেই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আছে। এরপর ওদেরকে সরকারি স্কুল কিংবা আধা-সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে হবে। সরকারি স্কুলে ভর্তির যে প্রতিযোগিতা ও বিড়ম্বনা, আধা-সরকারি স্কুলের যে খরচ সেসব মিলিয়ে পরিবার থেকেই লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নির্ঘাত বছর ঘুরতেই শুনবা বাকি দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে।

তারমানেই কন্যাশিশুর বিয়ে। বছর ঘুরতেই হৈমন্তীর মতো একটা কন্যাশিশুর কোলে থাকবে আরেকটা শিশু।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসাব মতে, সদ্য জন্মানো শিশুদের মধ্যে 'প্রাকৃতিক' জেন্ডার অনুপাত হলো এই রকম– প্রতি ১০০টি কন্যাশিশুর বিপরীতে ১০৫টি ছেলেশিশুর জন্ম হচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই এ অনুপাত মোটামুটি একই। শুধু চীন বা ভারতের মতো কিছু দেশ ছাড়া – কারণ সেখানে পিতামাতার কাছে ছেলেশিশু অধিক কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু কী কারণে ছেলেশিশু বেশি জন্মায় তা এখনও বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড স্টাইনজালৎস বলছেন, যে কোনো স্থান-কাল-পাত্রেই পুরুষের মারা যাবার ঝুঁকি নারীর চেয়ে বেশি। তাই বিবর্তনের নিয়মেই পুরুষ শিশুর জন্ম বেশি হচ্ছে, যাতে শেষ পর্যন্ত পরিণত বয়সে নারী ও পুরুষের সংখ্যায় একটা সমতা থাকে।' (তথ্যসূত্র: বিবিসি নিউজ, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮)

কন্যাশিশুর জন্ম ও অধিকার নিয়ে প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা গণমাধ্যমকে বলেন, 'নারীর অধস্তন অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্ব নারী আন্দোলন নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৯৫ সালে নারীর অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের জন্য ১২টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম একটি ইস্যু হলো কন্যাশিশুর অধিকার। এর আগে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু সনদ বলে একটি সনদ 'Convention on the Rights of the Child' গ্রহণ করে। এই বৈশ্বিক সনদ, বিশেষ কর্মসূচির ধারা-উপধারার সার নির্যাস হলো– কন্যাশিশুর জন্মের মুহূর্ত থেকে কৈশোর পার হয়ে জীবনচক্রের সব চক্র যখন অতিক্রম করবে, তখন যেন সে একজন পূর্ণ মানবসন্তান, পূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারে, নিজের জন্য উন্নত জীবন তৈরি করতে পারে। তার জীবনচক্রের বা পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার প্রতিটি পর্বে পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তাকে সব ধরনের আনুকূল্য প্রদান করবে। বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার সনদে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। সনদের ২ নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ-ভাষা-শারীরিক বিশেষ অবস্থা– এই সব কিছুর ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্র তার যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্ব নারী সম্মেলনেও কন্যাশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা– সব ধরনের সহিংসতামুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? ১৯৯০ থেকে ২০২৩ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করার ৩৩ বছর, প্রায় তিন যুগ অতিক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু সমাজে কন্যাশিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো আমরা কতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছি?' (তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ, ১১ অক্টোবর, ২০২৩)

উপকূলের কন্যাশিশুদের নিয়ে সুমন সিকদার এর 'অবহেলিত কন্যাশিশু' শিরোনামের নিউজ, যা ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম এ প্রকাশিত হয়। সে নিউজ ও আজকের সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর পেক্ষাপটে কিছু ব্যাখ্যা।

'ছেলে-মেয়ে সমান অধিকার! কিন্তু এই 'সমান অধিকার' স্লান বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরাসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে। জন্ম থেকেই বঞ্চনা নিয়ে বেড়ে ওঠে এখানকার কন্যাশিশু। গরিব বাবা-মায়ের পরিবারে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তাকে 'অভিশাপ' হিসেবে দেখা হয় উপকূলের বিভিন্ন চরাঞ্চলে। আর তাই জন্মের পর থেকেই তাকে হতে হয় বৈষম্যের শিকার। অধিকাংশ কন্যাশিশুকে প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে দেওয়া হয় না। বাবা-মা ভাবেন মেয়েদের পেছনে অহেতুক টাকা খরচ করে লাভ নেই!'– (তথ্যসূত্র: অবহেলিত কন্যাশিশু, সুমন সিকদার, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

২০১৬ সালের উপকূলের চিত্র এটি হলে ২০২৪-এর রাজধানীর বাস্তবতা হলো আমার চার কন্যাশিশুর ঘটনা। আমি নিজেই ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছি তারা পড়তে চায় কিনা? ওরা হ্যাঁ জবাব দিলেও জানায় পরিবারের বাধার কথা। এখনও অনেক পরিবার আছে যারা পরিবারের ছেলেশিশুকেই প্রাধান্য দিচ্ছে আর অবহেলা করছে কন্যাশিশুকে।

'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল'-এর পলিটিক্যাল ফেলো ও নারীনেত্রী বিথী হাওলাদার পূজা বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমকে বলেন, 'কন্যাশিশু হিসেবে জন্ম নেওয়াটাই এ সমাজে যেন পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের সব স্তরে তাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষার হার কম থাকায় সেখানে কন্যাশিশুর প্রতি অবহেলা একটু বেশি।' (অবহেলিত কন্যাশিশু, সুমন সিকদার, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

বরগুনা সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্বাস হোসেন মন্টু বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কমকে বলেন, 'মূলত উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ গরিব হওয়ায় তাদের মধ্যে সচেতনতা কম। তাই কন্যাশিশু অবহেলার শিকার হচ্ছে। ...দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ ছাড়াও গ্রামের অনগ্রসর বাবা-মাকে বোঝাতে হবে যে, কন্যাশিশুরাও শিক্ষিত হয়ে বড় হলে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে সক্ষম। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। ইউনিসেফ শিশুদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে পৃথিবীর প্রায় ১৬০টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ক্ষেত্রে গ্রামগঞ্জে ও দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ইউনিসেফ নির্মিত কার্টুন ছবি মীনা প্রদর্শন করলে শিশুদের অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সুন্দর জীবন বিকাশে অভিভাবকরা সচেতন হবে। শিশুর সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই

সমান গুরুত্ব দিতে হবে।' (অবহেলিত কন্যাশিশু, সুমন সিকদার, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

ইউনিসেফ এর মীনা কার্টুন আমাদের বাস্তব জীবনে কন্যাশিশুর জন্যে অনেক সৌভাগ্য বয়ে এনেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সৌভাগ্য ধরে রাখা যায়নি সেই প্রবাদের মতো– 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন'। কন্যাসন্তান শিক্ষিত হলে পরিবার হবে শিক্ষিত, এমন নির্মম সত্য বচন থাকলেও, একই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে টিকে লেখাপড়া করে চাকরি পেয়েও সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে একজন মাকেই ছাড়তে হয় সেই প্রতিযোগিতার চাকরিটা। সেটা সরকারি চাকরি হোক বা বেসরকারি চাকরি।

স্বাধীনতার বয়স ৫৩ বছর। এ সময় দেশের উন্নতি হয়েছে অনেক। এখানে কে কতটুকু অবদান রেখেছে তার হিসাবে বসিনি। বসেছি কন্যাশিশু নিয়ে বলতে। আজকের কন্যাই আগামী দিনের একজন নারী বা মা। এতোকিছু দেওয়ার পরও যখন শুনি কেউ বলে, 'চাই একজন পুরুষের নেতৃত্ব, নেতৃত্বে পুরুষ না থাকলে কী হয়?

তখন অবাক হই না, অবাক হলে কন্যাদের নিয়ে কাজ করতাম না। কন্যাদের নিয়ে আমার প্রথম কাজ 'একাত্তর ও নারী'। এরপরের কাজ 'ভাষাকন্যারা'। সামনে আসবে 'কলমকন্যারা'। ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে কাজ করবো বিপ্লবীকন্যাদেরকে নিয়ে। সেটা ১৯৪৭ এর আগের কন্যা হোক, আর ২০২৪ এর কন্যা হোক।

যখন একটা কন্যাশিশুকে হাসতে দেখি, আমার মনে হয় বিশ্ব হাসে ওর সঙ্গে। যখন একটা কন্যাশিশুকে তার অধিকার পেতে দেখি, মনে হয় বিশ্বের সব কন্যাশিশুই যেনো অধিকার পায়। যখন দেখি কন্যাসন্তান জন্মের পর আল্লাহর উপহার হিসেবেই কেউ তাকে জড়িয়ে নেয়, মনে হয় বিশ্বের সব কন্যাই যেনো হেসে উঠছে। কন্যার হাসিতে যেনো মায়ের হাসি ফোটে। কন্যাসন্তান গর্ভে ছিল বলে অপমান সইতে হবে না কোনো নারীকে। চাই এমন এক বিশ্ব, যে বিশ্বে সন্তান গর্ভে থাকলে পরিবার কৌতুহলে জানতে চাইবে না সন্তান ছেলে কিংবা কন্যা। অলিতে গলিতে, পাড়া মহল্লা থেকে শুরু করে দেশ-দেশান্তরের কন্যারা হাসবে, খেলবে, নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করবে নিজের মতো করে। তখন আপাময় আমজনতা হিসাবেই আমরা স্লোগান দিব– 'কন্যারা হাসলে হাসে বিশ্ব।'

রেভাঃ সত্যরাম ত্রিপুরা*

পাহাড়ি কন্যাশিশুর জীবন সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনীর অন্তরালে

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তা অনেকদিন আগেকার কথা। যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত পাহাড়ি অনুন্নত জন-জীবন তখন অশিক্ষা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তারা পাহাড়-পর্বতে এবং বনে-জঙ্গলে বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জনবসতি স্থাপন করে বসবাস করত। সেই সব ছোট ছোট জনবসতিকে 'পাড়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

তখনকার সেই সময়ে এক লোকালয় থেকে আরেক লোকালয়ের নাগাল পেতে, পায়ে চলা পথ ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং মাইলকে মাইল হাঁটতে হতো। কখনওবা পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে, আবার কখনওবা নদী-নালা, খাল-বিল ও ঝর্ণা-ছরা বেয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হত গন্তব্যের পৌঁছার অভিমুখে। বলতে গেলে তখনকার সেই সময়ে সহজ-সরল ও শান্ত-শিষ্ট সেই সব জনগোষ্ঠীর জনজীবনে তেমন বড় কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না। পাহাড়ে প্রধান পেশা হচ্ছে জুম চাষ করা। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিনিময়ে জুমে উৎপাদিত খাদ্য-শষ্য হিসেবে যা পাওয়া যেত, তা দিয়ে দু'বেলা, দু'মুঠো খেয়ে, শান্তিতে ও নিরাপদে দিন কাটতে পারলেই মিটে যেত জীবনের চাওয়া-পাওয়া।

পার্বত্য অঞ্চলে ১১টি আদিবাসীর বসবাস। প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকেরা আলাদা আলাদা নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলে, নিজস্ব বোনা ঐতিহ্যগত পোশাক পরিধান করে এবং নিজস্ব সংস্কৃতি অনুসারে জীবনযাপন করে। তাছাড়া স্ব স্ব সমাজ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর অলিখিত সামাজিক রীতি-নীতি রয়েছে। যেটাকে মুখরোচক প্রথাসিদ্ধ আইন বলা হয়ে থাকে। সেসব সামাজিক বিধির-বিধানে বেশিরভাগ কুসংস্কারই বড় স্থান দখল করে রেখেছে। সামাজিক বিধি-কলাপে নারীতে-পুরুষে বৈষম্য হয় এমন লিঙ্গ বিভাজন রীতি-নীতিতে ভরপূর।

* পরিচালক, মিনিস্ট্রি বিভাগ, বিটিএবিসি

পৃথিবীতে পুরুষতান্ত্রিক জনসমাজে সভ্য কি অসভ্য, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত বলে কোনো কথা নেই। বলতে গেলে প্রায় সব জাতি-গোষ্ঠীর জন-সমাজে বিশেষত নারীরা প্রবঞ্চনা, হয়রানি, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কন্যাসন্তান হলে ছেলেদের থেকে তাদেরকে আরও কিছু বাড়তি নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। যেমন ধরা যাক, কন্যাশিশুরা ছেলেদের সমানতালে চলতে পারবে না, এটা করা যাবে না, ওটা ধরা যাবে না, ঐখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক নিয়ম-নীতি।

আমি অন্য জাতির সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি না, বলতে চাচ্ছি স্বজাতির রীতি-নীতি অর্থাৎ উসই ত্রিপুরার সামাজিক প্রচলিত রীতি-নীতির বিষয়ে। পুরুষশাষিত সমাজে নারীর স্থান যে কত নিম্নতম এবং কত তুচ্ছিকৃত তা উসই ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য কতগুলো কূ-নীতি উপস্থাপন করলেই তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে সেইরকম বাধা-ধরা কতগুলো নিয়ম উল্লেখ করা হলো।

উসই ত্রিপুরার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জন-সমাজে আগেকার সময়ে এইরকম কূ-শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যে, 'নারীর পরিধেয় বস্ত্র ঝুলানো রয়েছে, এমন কোনো বাঁশ বা রশির ভিতর দিয়ে যদি কোনো পুরুষ গমন করে, তবে সেই অশুচি হয়ে যায়। এমনকি নারীর পরিধেয় বস্ত্র, পিনন কিম্বা বুক ঢাকা বস্ত্র স্পর্শ করলেও অশুচি বলে ধরা হয়। সেই কারণে সাধারণ নিয়মে বলা হয়ে থাকে যে, নারীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ যেখানে রাখলে পুরুষের সংস্পর্শ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন কোনো জায়গায় রাখা বা শুকানো যাবে না। যেমন, সিঁড়িতে উঠার জায়গায়, প্রবেশ দ্বারের পাশে এবং যেখানে লোকে সচরাচর গমনাগমন করে, এইসব জায়গায় রাখা যাবে না।

এই রকম কূ-শিক্ষা পাওয়ার ফলে, কোনো কারণে নারীর পোশাক পুরুষের গায়ে সংস্পর্শ লাগলে অথবা নারীর ব্যবহৃত পোশাক ধরতে গেলে পুরুষেরা দ্বিধাবোধ করে এবং ঘৃণা করে। এই রকম কূ-শিক্ষা এবং নারীদের প্রতি হীন মনোভাব থাকা এটাই প্রকাশ করে যে, পুরুষের চেয়ে নারীদের স্থান হলো অনেক নিচে। যদিও লিঙ্গ বিভাজনের কারণে নারীকূলকে এত বৈষম্য, এত প্রভেদ এবং এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করা উচিত নয়। যৌক্তিক বিচারে যদি চিন্তা করি, কেউ যদি কোনো পশুর স্পর্শ করে ফেলে, স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে মনে করা হতে পারে যে, হয়ত হাতে ময়লা লেগে গেছে অথবা কোনো জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। কিন্তু কখনো এইভাবে ভাবা হয় না, লোকটা পশুর স্পর্শ করার ফলে অশুচি হয়ে গেল। সেইক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দেয় যে, তাহলে কি নারীরা পশু চেয়েও অধম? নারীরা কি তাহলে মানুষ নয়? পুরুষেরাও মানুষ এবং নারীরাও মানুষ, যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে মানুষে মানুষে কেন এত বৈষম্য এবং এত পার্থক্য?

কন্যাশিশু বেড়ে ওঠার পর যখন পরিণত বয়সে তাকে বিবাহ দিতে হয়, যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে এতে তার মত আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয় না। বিবাহে অমত

থাকলেও জোর করে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়ে যায়। তাও আবার চেনা-জানা হলে কোনো কথা-ই ছিল না। জন্ম হওয়ার পর থেকে যার সঙ্গে এক পলকের জন্যও দেখা হয়নি এবং বিবাহ আসরেই যার সাথে প্রথম দেখা, তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্যা অমত হয়ে বিবাহ আসরে আসতে না চাইলে অথবা লুকিয়ে থাকলে বলা হতো 'মেয়ে মানুষ তো! লাজ-লজ্জা তো থাকবেই!' অথচ কন্যার যে বিবাহে অমত রয়েছে, সে কথা ভুলক্রমে উচারণও করা হতো না। এই রকম অবস্থায় কনেকে বিবাহ আসরে আনা না গেলে, অথবা খুঁজে পাওয়া না গেলে, তার ব্যবহৃত পরিধেয় পোশাকের সঙ্গেই বরের বিবাহ সম্পাদন করা হয়ে যেত। এরপরে কনেকে তার পোশাকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া বরকেই, স্বামী হিসেবে বাধ্যগতভাবে বরণ করে নিয়ে সংসার করতে হতো।

তবে হাতের দশটা আঙ্গুল যেমন এক সমান নয়, ঠিক তদ্রুপ সব কন্যারাও তেমনি একই সমান নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহসী কন্যারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মতের বিরুদ্ধে সম্পাদিত সেই বিবাহ কিছুতেই মেনে নিতে চায় না, জোর খাটালেও না। বরঞ্চ তার বিদ্রোহী মন, আরও বিগড়ে যায়। এতে হিতে বিপরীত ফল হয়। কোনো উপায় না দেখে অবশেষে সেই কন্যা গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়। কন্যার অমতে এইভাবে জোর করে বিবাহ দিতে গিয়ে, অথবা কন্যার নিজের পছন্দ করা কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ না হওয়ায়, লোমহর্ষক অনেক অঘটন ঘটে যায়। ত্রিপুরা জন-সমাজে এখনো সেইরকম অনেক লোক-কাহিনি বা পৌরাণিক গল্প মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।

এগুলো ছাড়াও ত্রিপুরা সামাজিক প্রথা সিদ্ধ আইনে নারী বৈষ্যমমূলক আরও কালা-কানুন রয়েছে, যেমন 'উত্তরাধিকারী সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তির বণ্টনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, কন্যাসন্তানেরা পুত্রসন্তানদের সমতুল্য সম্পদের অংশীদার হতে পারবে না। কেবল মায়ের ভাগে প্রাপ্য অংশ থেকে তারা সম্পত্তির ভাগ পাবে।' এসব কালা-কানুন লিঙ্গবৈষম্য সৃষ্টি করারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। কেননা, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তারা একই বাপ-মায়েরই সন্তান, তাদের উভয়ের শরীরে বইছে বাপ-মায়ের একই রক্ত। প্রশ্ন হলো, তা হলে কেন এত প্রভেদ কিংবা এত পার্থক্য? তাই তো বলি, বৈষম্যমূলক এই সব কালা-কানুন একজনকে হাসায়, আবার অপরজনকে কাঁদায়।

এতো গেল পূরনো আমলের ইতিকথা। তখনকার সেই সময়ের নিরক্ষর, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও অনুন্নত সমাজের কথা বাদই দিলাম। এবার বলছি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে। বর্তমান এই সময়ে স্বাধীন বাংলার উন্নয়নের জোয়ার, পাহাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেন ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। পাহাড়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় যোগাযোগের জন্য বর্তমানে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং উন্নত জীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য

কিছু কিছু পাড়ায় সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সেই সুবাদে বলতে গেলে, পাহাড়ে এখন লেখাপড়ার ধূম পড়ে গেছে। সময়ের কালচক্রে সভ্যতার সংস্পর্শে, ধীর-লয়ে সমাজে অনেক কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন, জীবনধারা, জীবন-জীবিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-খাদ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

এসব দেখে মনে হচ্ছে, পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যে অশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির অন্ধকারের খোলস থেকে, মাথাচাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসার তোড়-জোড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে যেন। পরিবর্তনের অভিযাত্রার এই ম্যারাথনে অন্য সব কিছুতে কিছুটা এগিয়ে গেলেও, ডিগবাজি খেয়ে সামাজিক কিছু কালা-কানুন, এখনও মুখ থুবড়ে নিথর হয়ে পড়ে আছে। বিশেষ করে নারীর প্রতি আগের সেই বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে। পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ, অনেক কিছু ছেড়ে আসতে পারলেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক রীতি-নীতির পিছুটান রয়ে গেছে। মনের গভীরে সেই দাগটা এমনভাবে গাঁথা হয়ে গেছে, যা ঘঁষা-মাজা করেও কিছুতেই মোছা যাচ্ছে না।

অন্যান্য বিষয়ে যেমন করে লিঙ্গ বিভাজনের মনোভাব কাজ করছে, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তাই। পার্বত্য বন-ভূমিতে যখন প্রথম লেখাপড়া শুরু হয়েছিল, তখন ভাবা হতো লেখাপড়া শুধু ছেলেদের জন্য। কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে বলা হতো, 'মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কী করবে? তারা কাপড় বুনবে, জুম চাষ করবে এবং গৃহস্থালি কাজ করবে। এগুলোই তো তাদের কাজ'। অভিভাবকদের এই ভুল মনোভাব শুধরে নিতে অনেক সময় লেগে গেলেও, বর্তমানে কন্যাশিশুদের ভাগ্যে লেখাপড়া করার সুযোগ মিলছে।

তারপরও কিন্তু সমস্যা একেবারে চুকে যায়নি, বরং সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নিম্নে পাহাড়ি শিশুকন্যাদের জীবন সংগ্রামের কতগুলো চিত্র তুলে ধরা হলো:

১. বর্তমানেও পাহাড়ে প্রায় পাড়াগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সরকারি-বেসরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। এমতাবস্থায় কম বয়সী শিশুদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে লেখাপড়া করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই যেসব পাড়াগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, সেসব পাড়ার কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়েদের হাতেখড়ি করার সুয়োগ মেলে না। তাই তাদেরকে নিরক্ষরতার অভিশাপ নিয়েই জীবন কাটাতে হয়।

২. প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত, আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে। প্রাইমারি পর্যায় শেষ হওয়ার পরে কাছে জুনিয়র স্কুল বা হাইস্কুল না থাকায়, দূরে কোথাও গিয়ে লেখাপড়া করতে হয়। সেক্ষেত্রে পরিচিতি কোনো লোকের বাড়িতে অথবা কোনো হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া করাতে হয়। অনেক বাবা-মা সেরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায়

ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ব্যাহত হয়ে যায়। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সমস্যা হয়, কেননা তাদের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য থাকার জায়গা দরকার।
৩. যে পরিবারে সন্তান-সন্ততি বেশি, সেই পরিবারে আর্থিক দৈন্যদশার কারণে সব ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য থাকে না। এমতাবস্থায় বাবা-মাকে বিবেচনা সহকারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সন্তানদের মধ্যে বেছে নিয়ে কাকে লেখাপড়া শেখাবেন। এরকম পরিস্থিতিতে বাবা-মায়ের বিবেচনায় ছেলেরাই বেশি প্রাধান্য পায় এবং কন্যাশিশুরা বাদ পড়ে যায়। এই হলো কন্যাশিশুদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা। যে কন্যারা জ্ঞান সাধনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, সে কন্যারা ভাগ্য গড়ার সুযোগবঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে বনে-জঙ্গলে।

৪. জুনিয়র স্কুল অথবা হাইস্কুলে লেখাপড়া করার জন্য জেলা-উপজেলা সদরে কিংবা শহরে অবস্থান করে লেখাপড়া করতে হলে, কন্যাশিশুদেরকে নানা রকম ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে অধিকাংশ বাবা-মা অশিক্ষিত, সেই কারণে তারা শহরের পথ-ঘাট চেনেন না। পথ না জানার কারণে হোক অথবা যাত্রা খরচ সাশ্রয়ের কারণে হোক, অনেক সময় বাবা-মা নিজেই না গিয়ে কন্যাশিশুকে অন্য কোনো লোকের মারফতে হোস্টেলে প্রেরণ করেন। সেক্ষেত্রে ভাল লোকের পাল্লায় পড়লে কোনো অসুবিধা থাকত না, কিন্তু খারাপ লোকের খপ্পরে পড়লে কন্যাশিশুদের যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। যাকে রক্ষক করে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই ভক্ষক হয়ে ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া হোস্টেলে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

৫. পরিবেশ-পরিস্থিতি কারণে পাহাড়ি অঞ্চলে মান-সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা না পাওয়ায়, পাহাড়ি শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার ভিত্তি নড়বড়ে হয়। সেরকম হলে বড় ক্লাসে গিয়ে ঝরে যায়, অথবা বাবা-মা লেখাপড়ার খরচ বহন করতে না পারায় লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এরকম ঝরে পড়া অথবা বাধ্যগতভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পাহাড়ে অল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ছেলে-মেয়ের সংখ্যাই অনেক বেশি। তারা না পারছে চাকরি করতে এবং না পারছে জুম চাষ করতে, বেকায়দায় পড়ে বেকার হয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বেকার বসে থাকা কন্যাশিশুদের দুর্বলতার সুয়োগ নিয়ে, অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য ভুলিয়ে-ভালিয়ে পটানোর চেষ্টা করে। এভাবে অনেক লম্পট এবং নারী পাচারকারী চক্র বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কন্যাশিশুদেরকে ফাঁদে ফেলেছে। সহজ-সরল কন্যাশিশুরা ভাল-মন্দ বুঝতে না পেরে, সহজে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে, অনেকেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এরকম অনেক খবর দেশীয় সংবাদ মাধ্যমে অহরহ প্রকাশ হতে দেখা যায়।

উপরোল্লেখিত বহুবিধ কারণসমূহের ফলে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে কন্যাশিশুদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তাহীন জীবন কাটাতে হয়। নিজের জীবনকে

শিক্ষায়-দীক্ষায় ও জ্ঞানে-গুণে উন্নত জীবন গড়ে তুলতে, অথবা জীবন-জীবিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারে না। জীবনে অগ্রসর হতে পদে পদে তাদের কত প্রতিবন্ধকতা, কতই না সংকট। এতোসব বাধা-বিঘ্নকে চড়াই-উৎরাই করে পার হতে পারে না বলে তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়।

সব মানুষই জীবনে একটুখানি সুখ চায় ও শান্তি চায়। কিন্তু পাহাড়ি কন্যাশিশুদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। তাদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে না। এভাবে অনাদরে ও অবহেলায় তাদের সুন্দর জীবন হারিয়ে যায় দুঃখ-দুর্দশার অন্তরালে। তাই তাদের মলিন মুখে হাসি ফোটাবার জন্য যে যেভাবে পারেন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি।

শীপা হাফিজা*

বাল্যবিবাহ নির্মূলেই সম্ভব বৈষম্যহীনতার প্রাথমিক ধাপ উত্তরণ

বাংলাদেশের জন্য বাল্যবিবাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যা একাধারে ম্যান ম্যাড বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফসল, যা সরাসরি মানবাধিকার হরণ করে এবং যার কু-প্রভাব প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হতে সক্ষম।

২০১০ এর বেসরকারি পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন চাহিদাপত্র পর্যালোচনা থেকে বিষয়টি আমাদের নজর কাড়ে। জানা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন চাহিদার তাৎক্ষণিক অসম্পন্ন কাজের মধ্যে দুটি বিষয়ে সবচেয়ে আশু নজর দেওয়া অর্থাৎ অবস্থার পরিবরতন প্রয়োজন। সে দুটো হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহ নির্মূলকরণ। যেহেতু শিক্ষা নিয়ে কাজ করার অনেক সংঘবদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ রয়েছেন আমরা বিভিন্ন উন্নয়নকর্মীরা জোট বেঁধে তাই বাল্যবিবাহ নির্মূলকরণে মনোনিবেশ করেছিলাম।

এই একটি সমস্যা বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আরও অন্য যেকোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহকে সরাসরি প্রভাবিত করে, কাজেই এতে মনোযোগী না হলে অন্য বৃহদাকার সমস্যাসমূহ আরও বেশি প্রকট, জটিল ও ভয়াবহ হয়ে ওঠতে পারে।

বাল্যবিয়ে নামক অভিশাপের কারণে অসংখ্য তরুণীর জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভের তথ্য ব্যবহার করে তৈরি করা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশু বিয়ের প্রচলন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং বিশ্বের মধ্যে অষ্টম সর্বোচ্চ। এ দেশে তিন কোটি ৮০ লাখ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে এবং এক কোটি ৩০ লাখ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৫ বছরের আগে।

*** সমতা, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি কর্মী এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ**

ঢাকা পোস্টের প্রতিবেদক তানভীরুল ইসলামের ২০২৩ ডিসেম্বরের তথ্যানুযায়ী,

♦ ২০১৮ সালে দেশে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৫৯ শতাংশ, যা বর্তমানে ৫০;

♦ ২০১৮ সালে কৈশোর গর্ভধারণ ছিল ৩১ শতাংশ, যা বর্তমানে ২৪;

♦ ২০১৮ সালে দেশে খর্বাকৃতি শিশু ছিল ৩১ শতাংশ, বর্তমানে যা ২৪।

তিনি আরও জানান যে, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে-২০২২ (বিডিএইচএস) রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখনো বাল্যবিয়ের হার ৫০ শতাংশ। এমনকি বাল্যবিয়ের ফলে দেশে বর্তমানে অ্যাডোলোসেন প্রেগন্যান্সির হার ২৪ শতাংশ। জরিপের তথ্যমতে, বছরে দেশে যতগুলো মায়ের মৃত্যু হয়, তাদের ৪০ শতাংশের মৃত্যু হয় ১৮ বছরের আগে গর্ভধারণকালীন সমস্যায়। গবেষণা বলছে, ১০০ মাতৃমৃত্যুর মধ্যে ৪০ জনের মৃত্যু হয় কৈশোর গর্ভধারণের ফলে।

বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ প্রদানের ফলে একটি মেয়ে/নারী বা তার পার্টনারের জীবনে, সর্বতোভাবে জাতীয়ক্ষেত্রে যেসকল ভয়াবহ অমঙ্গল ঘটতে পারে তার কিছু কিছু উদাহরণ মাত্র তুলে ধরার প্রয়াশ;

♦ বাল্যবিবাহ ও কিশোর/বয়ঃসন্ধিকাল গর্ভধারণ (১৫-১৯ বছর বয়সে গর্ভধারণ) মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ। ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দেওয়া মায়েদের মৃত্যুঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে– গর্ভকালীন জটিলতা, প্রসব-পরবর্তী ও প্রসবকালীন রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি।

♦ ২০২৩ এ মার্চে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সর্বশেষ বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (২০২২) প্রকাশ করে। এতে বছরভিত্তিক মাতৃমৃত্যুর চিত্র দেখানো হয়। গত সাড়ে তিন দশকের মাতৃমৃত্যুর হারে ২০০২ ও ২০০৭ সালে মাতুমৃত্যু আগের বছরের তুলনায় বেশি ছিল। আবার ২০২১ সালেও আগের বছরের তুলনায় মাতৃমৃত্যু বেশি দেখা যায়।

♦ মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমানোর ক্ষেত্রে মার্চ মাসে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বাংলাদেশে উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করলেও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বলছে, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমানোর উন্নতির পথে এখনো কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এগুলো হলো– অতি অল্পবয়সী প্রসূতি মায়ের মাতৃসংক্রান্ত জটিলতা, বাল্যবিবাহ ও পরবর্তীকালে গর্ভধারণ।

♦ বয়ঃসন্ধিকালীন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ও অপরিণত (২২-২৩ বছরের নিচু বয়সের) মায়ের গর্ভের সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে খর্বাকৃতি হয় এবং তাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিও ব্যাহত হয় বলে বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়। এমতাবস্থায় আমরা মেয়েদেরকে ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে এমন একটি প্রজন্ম/জাতি তৈরি করছি যে জাতিটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বুদ্ধিবৃত্তিতে এবং শারীরিকভাবে যথাযথ বাড়-বাড়ন্ত হবে বলে সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে।

♦ একটা শিশু তার জীবনের মেয়েবেলাকে হারিয়ে ফেলে এই বৈবাহিক সম্পূরক তৈরির কারণে। বাচ্চাটি খেলনা ফেলে হাতে তুলে নেয় খুন্তি আর ঝাড়ু। এক্কাদুক্কা রেখে যৌন সহিংসতার শিখনে দেয় হাতখড়ি, যা তার জীবনের সম্ভাবনার মোড়কে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। তারা শিক্ষা, চাকরি ও বাল্যকালের প্রাপ্তি অন্যান্য সবধরনের সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। সভ্য নামক এই সমাজ তাকে লোক সম্মুখে ঘটা করে একটা নির্লজ্জ, অন্যায়, অসম এবং অমানবিক জীবন গ্রহণে বাধ্য করে। কী অদ্ভুত অপাংক্তেয় এক জীবনব্যবস্থা, যা একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের কীর্তি বলে বিবেচিত। এ লজ্জা কার? শিশুদের কি?

♦ বাল্যবিয়ের শিকার শিশুদের ছোটখাট উদ্যোগসমূহ প্রায়শই বাধার সম্মুখীন হয়, কখনো পারিবারিক সহিংসতা বা জটিলতায়, অথবা স্বামী-শ্বশুরের বাড়িতে থাকা মেয়েটি তার ব্যবসার জন্য প্রচারণা বা কাজের কোনো সাইনবোর্ড লাগাতে পারে না। কারণ জমিটি বা বাড়িতে তার মালিকানা নেই, যা ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

♦ আমরা দেখেছি কোভিড-১৯ সময়ের সরকারপ্রদত্ত অনুদানের সুবিধা ক্ষুদ্র বা মধ্যম শ্রেণির উদ্যোক্তা হওয়া সত্ত্বেও এই নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিতে পারেননি। কারণ তাদের পরিচয়পত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অভাব ছিল। কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও সেখানে তারা পৌঁছাতে পারেননি। এভাবে তারা যেকোনো ছোটখাটো চাকরি, উদ্যোগ বা ব্যবসা করার ক্ষেত্রেও বঞ্চনার শিকার হয়।

♦ তারা প্রায়শই অধিকহারে পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতন, অবহেলা এবং নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়। ভাগ্যের পরিহাসে তাদের পরিবার অর্থাৎ বাবা-মায়েরা ভালো-ছেলে পেয়েছেন মনে করে, উপরন্তু ঘরে এক প্লেট খাবার বেঁচে যাবার আশায় যে শিশু মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেন, সেই মেয়েটিই অচিরেই দু-চার সন্তান সঙ্গে নিয়ে অসুস্থ শরীরে বাপের বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়। কারণ অপরিণত শরীর ও মন বিবাহিত জীবনের ঘরকন্না ও যৌন সম্পর্কের ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে, শরীর হয়ে পড়ে অসুস্থ ও জরাকীর্ণ। ফলে স্বামী বা শ্বশুরবাড়িতে সে অপাংক্তেয় হয়ে ওঠে, স্থান হয় বাপের বাড়িতে। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বাবা-মা বয়স বা আর্থিক অনটনের কারণে সন্তান ও তার শিশুদের দায়ভার বইতে অপারগ হন, মেয়েটি হয় অন্যের বাড়িতে কাজ বা ভিক্ষাবৃত্তি করে, কাজেই যৌন হয়রানি ও সহিংসতা তার পিছু ছাড়ে না। প্রায়শ একই পরিণতিতে পড়ে তার শিশুসন্তানেরাও, যাদের কিনা ঐ বয়সটি ছিল আদর-যত্নে হেসে-খেলে বেড়ানোর, নিদেনপক্ষে শিশু দিবাযত্নে থাকার সময়। বাল্যবিবাহের শিকার এই শিশুরা বেড়ে ওঠে ছেলেবেলা বা শৈশবকালহীন 'নারী' হয়ে। নিত্ত সাথী যাদের অপমান, অনাহার ও অসম্মান।

♦ বিবাহিত মেয়েদের যৌনবাহিত সংক্রমণ (sexually transmitted infections বা STI) অথবা যৌনব্যাধি (venereal diseases বা VD) সংক্রান্ত মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকিও

রয়েছে। সেই হিসেবে তাদের জন্য স্বাস্থ্য ও মনোঃসামাজিক সেবা নিতান্তই অপ্রতুল।

♦ উপরোক্ত সকল পরিণতি বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় এটা বলা বাহুল্য যে, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহের শিকার অধিকাংশ শিশুরা (মেয়ে ও ছেলেরা) নিজ, পারিবারিক, পাড়ার, সমাজের এবং জাতীয়ভাবেই যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তিতে ভোগে এবং তাদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয় না, যার ফলে তারা নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তাদের স্বনির্ভরতাকে খর্ব করে নিজ কাজ, ভাবনা ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়। জাতীয় উন্নয়ন ক্ষেত্রে/অংশীদারিত্বে যা একটি বৃহৎ কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতি।

যে দেশের তরুণ সমাজ ও জনমানুষ আদর্শে একমত এবং একত্রে আন্দোলিত হলে জগদ্দল পাথরের মতো চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদী, নৃশংস অত্যাচারী, অতিধূর্ত, সর্বগ্রাসী ও ভোগী স্বৈরাচারী জান্তাকে পদদলিত হতে সময় লাগে না, সেই একই দেশ ও সমাজে তাদের আপনজনদের (সম্ভাব্য কাছাকাছি বয়সের গোষ্ঠী) এভাবে সুযোগবঞ্চিত অবস্থায় ও চূড়ান্ত অবহেলায় ফেলে রাখা কি ন্যায়সঙ্গত, নাকি সাম্যের বাহক? আমরা মনে করি তা সামাজিক বৈষম্যকে গভীরভাবে ধারণ করে। যে বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে সর্বোপরি দায়ী হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র, যা বিচারহীনতা ও অব্যবস্থাপনা, উপরন্তু শ্রেণিবৈষম্য ও পুরুষতন্ত্রকে ধারণ করেছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বৈশ্বিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশও তাদের বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, বাংলাদেশের তা না পারার ও কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না, আছে কি?

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বাল্যবিবাহ রোধ করতে ১৯২৯ এর পর প্রথম একটি আইন পাশ করা হয় ১৯১৭ সালে, 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' নামক। দুর্ভাগ্য বলার কারণ হচ্ছে এই আইনে যদিও বলা আছে মেয়েদের ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স হচ্ছে আইনসম্মত বিয়ের বয়স, কিন্তু একই আইনের ১৯ নম্বর বিশেষ ধারায় রয়েছে 'বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন এটি শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে হয়' তখন এই আইনে ছাড় দেওয়া হয়েছে, যা আইন দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম বয়সের আগে পিতা-মাতার এবং বিচারিক সম্মতিতে শিশু বয়সেই বিবাহের অনুমতি দেয়। তার মানে ১৮'র আগে যেকোনো বয়সে অনুমতি দেয়।

এখানে বলা বাহুল্য যে, আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জানামতে ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রতিরোধকল্পে আপামর জনসাধারণের উদ্যোগে/মাধ্যমে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল, যেখানে তৃণমূলের সব বয়সের নারী, পুরুষ, তরুণসমাজ, সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থী, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেতৃত্ব স্থানীয় জনগণ এমনকি স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, এবং জনপ্রতিনিধিগণও পলিসি অ্যাডভোকেসিতে প্রভাবান্বিত হয়ে এক কাতারে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। যার

প্রভাব তখন প্রত্যক্ষ হয়েছিল দেশের মাঠে-ঘাঠে, মা-বাবারা যারা অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, বলেছিলেন তারা যে কী ভুল করেছেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে। অনেকেই মনে করেছিলেন ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন মেয়েকে সুখী করতে, কিন্তু ফলাফল হয়েছে ঠিক উল্টো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকেনি এটা তারা জানেন, তাই আর চান না আর কোনো বাবা-মা ও সন্তানের জীবনে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি হোক, যদিও তারা অন্যান্য অনেক সমস্যা নিরসন করতে না পেরে শিশুকন্যার বিয়ে দিতে বাধ্য হন। সে সময়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এই জনমত বেশ প্রকট হয়ে ওঠছিল এবং এব্যাপারে ইতিবাচক পরিবর্তনের দামামা বেজে ওঠেছিল। এটা সত্য যে, সরকারের ঐ সংক্রান্ত সকল দপ্তর ও মন্ত্রণালয়সমূহ এ ব্যাপারে ভালোভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন।

এমন একটি সময় প্রবাহে ২০১৬ সালে হঠাৎ করেই বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে বাল্যবিবাহ আইনটির খসড়া প্রকাশ করে এবং তাতে মতামত আদান প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে নাগরিক উদ্যোক্তাদের জোর দাবিতে তারা সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় শরিক হতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জনগণের কোনো পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ রেখে আইন প্রণয়ন হয়, যা পরবর্তীতে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম-সহ অন্যান্যদের কঠোর সমালোচনার প্রেক্ষিতে বয়সসীমা ১৮ তে উন্নীত হয়। যেখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বল্পসংখ্যক নারীনেত্রীরা এ ব্যাপারে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করলে তিনি মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮'র নিচে নামবে না, এ ব্যাপারে আমাদের আশস্ত করেন। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন এই বয়সসীমা ১৮'র নিচে নামবে না, আমি তা দেখব।

শেষ হয়েও হইল না শেষ, কেননা বিয়ের বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ তে আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হলেও মন্ত্রণালয় একটি নতুন ধারা সংযোজন করে দেন– যে বিষয়ে আগে কখনও কোথাও আলোচনা হবার কোনো খবর শোনা যায়নি– যে ধারায় অতি অল্প ও অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত সিদ্ধ করা হয়।

পরিণতিস্বরূপ নীরবে ঘরে-ঘরে বাল্যবিবাহের সংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু তা সরকারি কোনো নথি/রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয় না। কারণ অল্প ও অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেওয়াটা আইনত সিদ্ধ ব্যাপার হয়ে গেছে। কাজ করতে গিয়ে এমন অনেক সরকারি কর্মকর্তার মুখে ব্যক্তিগত বা সভার আলোচনায়ও শোনা গেছে যে তারা নৈতিকতার কারণে ব্যক্তি উদ্যোগে নীরবে বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজ করলেও দাপ্তরিকভাবে তা তারা করতে পারেন না। করলে আইন ভঙের দায়ে পড়বেন।

এই কারণে পরবর্তীতে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া বেশ দুরূহ বলে মনে হয়। বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমে গেছে বলে রটনা প্রসারিত হয়।

বাল্যবিবাহ সমস্যাটি একটি বহুমাত্রিক সমস্যা– মেয়েবেলাহীনতা, অধিক হারে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানি, অপুষ্টি, শিশুর ভগ্ন ও অপর্যাপ্ত শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তার ক্ষরণ, শিশু ও নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন, অল্প বয়সেই অপমান ও অবহেলার শিকার, শিক্ষা, অর্থোপার্জন, অপরিকল্পিত ও অসুস্থ জনসংখ্যা, জাতীয় মানসম্মত শিক্ষার হার, দরিদ্রতা ও অতি-দরিদ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি– বিধায় জাতীয় পর্যায়ের আশু সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।

২০১৭ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯১৭'র একটি জাতীয় পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে, সেই পরিকল্পনাতে যদিও চেষ্টা করা হয়েছিল যে আইনের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে কাটিয়ে পরিকল্পনা করার। কিন্তু এখন সময় এসেছে তা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের। এবং পরিকল্পনাটিকে পা পা করে হাঁটাতে অর্থাৎ বাস্তবায়নের পথগুলোকে সুস্পষ্ট করা জরুরি এবং সর্বোপরি জবাবদিহিতাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আমি মনে করি, আইনের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপসমূহকেও যথাযথভাবে কার্যকর করার এখনই সময়।

আমাদের নতুনভাবে পাওয়া এ দেশটিকে মানবতাকামী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার তুলার এসেছে অফুরন্ত সুযোগ। এই দেশটিতে সকল মেয়ে ও ছেলেশিশুরা তাদের নিজ জীবনের আনন্দ, আহ্লাদ, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা যেন নিজ পছন্দে ও আগ্রহে বাছাই করে নিতে সমর্থ হয়। যা দেশকে, দেশের উন্নয়নকে তরান্বিত ও সম্পূর্ণ করতে পারে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সেভাবেই অর্জন করা বাঞ্ছনীয়, যেখানে এই সাম্য, সমতা ও বিচিত্রময়তার পথযাত্রায় কেউ রবে না পেছনে পড়ে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করি– এই হোক বৈষম্য বিরোধী একটি দেশের নতুন সংকল্প।

সজীব সরকার*

ইতিহাসের ভাষ্যে নারীর অনুপস্থিতি : কারণ ও প্রভাব

আমি বর্তমানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি, সেখানে সম্প্রতি জেন্ডার বিষয়ক এক গবেষণার অংশ হিসেবে কিছু বিষয়ে লেখা তৈরির দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এ কাজের সূত্রে নানা ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন ও বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি বইও পড়ার সুযোগ হয়েছে। ওই বইয়ের একটি অংশের আলোচনায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে : 'কার ইতিহাস'?

বর্তমান লেখার প্রসঙ্গও এটিই : আমাদের চিরচেনা ইতিহাস আসলে কার ইতিহাস? এ ইতিহাসে কার কথা বলা হয়েছে? এ ইতিহাসের 'অথর' ও 'অ্যাক্টর' কে বা কারা? ইতিহাসের এমন ন্যারেটিভ নির্মাণ কি যৌক্তিক? এসব ন্যারেটিভ কি পূর্ণাঙ্গ বা সত্য বয়ান?

গবেষণার ওই কাজটি করতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কাজের একটি সূত্র তৈরির প্রয়োজন অনুভব করি। এ লক্ষ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতি (র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং) এবং বিশেষ করে সুবিধাজনক নমুনায়নের (কনভেনিয়েন্ট স্যাম্পলিং) মাধ্যমে বাছাই করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নারী ও পুরুষ) কিছু প্রশ্ন করি। এসব

ক্রম	প্রশ্ন	সবচেয়ে বেশিবার পাওয়া উত্তর
১	একজন বিজ্ঞানীর নাম	আইনস্টাইন, নিউটন
২	একজন নোবেলজয়ীর নাম	আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন
৩	একজন সাহিত্যিকের নাম	হুমায়ূন আহমেদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সমরেশ মজুমদার
৪	একজন রাজনীতিবিদের নাম	ডোনাল্ড ট্রাম্প, বারাক ওবামা
৫	একজন চলচ্চিত্রনির্মাতার নাম	হুমায়ূন আহমেদ, স্টিভেন স্পিলবার্গ
৬	একজন মহাকাশচারীর নাম	নিল আর্মস্ট্রং
৭	একজন ক্রিকেটার বা ফুটবলারের নাম	কোহলি, ধোনি, সাকিব আল হাসান, মাশরাফি; মেসি, রোনালদো
৮	ইতিহাসখ্যাত একজন বিপ্লবী, যোদ্ধা কিংবা শাসকের নাম	হিটলার, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন

*** সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ও প্রতিষ্ঠাতা, মিডিয়াস্কুল**

প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তর এখানে নমুনা হিসেবে আংশিকভাবে উল্লেখ করছি : উত্তরের তালিকায় চোখ বুলালেই দেখতে পাবো, এখানে একজনও নারী নেই। এসব পেশা বা পরিচয়ের প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নই করা হোক, উত্তরদাতাদের মন অনিবার্যভাবে একজন পুরুষের প্রতিকৃতিই খুঁজে নিয়েছে। খুব বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ জরিপের আওতায় আনা হয়নি – এ কথা সত্য; উত্তরদাতার সংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো হলে হয়তো নারীদের নামও উচ্চারিত হতো, তবে তা পুরুষের সমসংখ্যক হতো বলে বিশ্বাস করা কঠিন!

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

প্রশ্নে উল্লেখ করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল কৃতিত্বের কারণে নারীদের নাম আসতে পারত। কিন্তু, এখানে উত্তরদাতাদের মন যে এসব প্রশ্নে একজন পুরুষের প্রতিকৃতিই খুঁজে পেয়েছে, এর কারণ কী? সহজ উত্তর হয়তো: সামাজিকীকরণ। মানবসমাজের ইতিহাস সবসময় পুরুষকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো, ইতিহাসের লেখক মূলত পুরুষ। আর, ইতিহাসের (পুরুষ-) ভাষ্যকারেরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বা তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই মূলত ইতিহাস রচনা করেছেন। ফলে, অবলীলায় তারা নারীদের অবদানকে বেমালুম অস্বীকার বা উপেক্ষা করে এককভাবে পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এমন একটি অপূর্ণাঙ্গ ও অসত্য বা অর্ধসত্য ইতিহাসের মধ্যেই সবার সামাজিকীকরণ ঘটে।

এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই; ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে না দেখলে এমন সামাজিকীকরণ বা জেন্ডার বৈষম্যমূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ সন্ধান সম্ভব নয়। মানবসমাজের ইতিহাস কেবল সভ্যতার অগ্রযাত্রার ইতিহাস নয়; এই ইতিহাস জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ইতিহাস এবং অনিবার্যভাবে এমন বৈষম্যেরও ইতিহাস।

ইতিহাস বলার প্রবণতা এখনো পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক। এখন পর্যন্ত লিখিত ও মৌখিক (ওরাল) ইতিহাসে পুরুষই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মূল চরিত্র আর নারী এখনো অনেকটাই অনুক্ত, উহ্য। অর্থাৎ, ইতিহাসের প্রচলিত বয়ানে পুরুষের কথা যতোটা উঠে আসে, নারীর কথা ততোটা আসে না। আর নারীর গল্প খানিকটা ওঠে এলেও সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারীর সক্রিয় অবদানের কথা সেখান থেকে সচেতনভাবে বাদ দিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এভাবে সমাজটা হয়ে ওঠে পুরুষের এবং 'মানুষের ইতিহাস' হয়ে ওঠে আসলে 'পুরুষের ইতিহাস'।

ইতিহাসের পাঠ মানুষ গ্রহণ করে পূর্বজদের কাছ থেকে, পাঠ্যবই থেকে এবং শিল্প-সাহিত্য-বিনোদনসহ গণমাধ্যমের নানা উপকরণ (আধেয়) থেকে। কিন্তু ইতিহাস বয়ানের এই সবগুলো উৎসই পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতার দোষে দুষ্ট। সবখানেই সবকিছুর

প্রতিনিধি হিসেবে প্রাধান্য পায় পুরুষ চরিত্র; নারী চরিত্র কিছু যদি থাকেও সেখানে, তা হয় খুব সামান্য বা সাধারণ ও দুর্বল। এ কারণেই জন্মের পর থেকে একটি শিশুর সামাজিকীকরণ হয় পুরুষপ্রধান একটি আবহের মধ্যে।

ইতিহাসের নানা পাঠে সবসময়ই পুরুষের সংখ্যাধিক্য এবং এর বিপরীতে নারী উপেক্ষিত। এতে মনে হতে পারে, ইতিহাস নির্মাণে তথা ইতিহাসের নানা কালপর্বে সমাজ বিনির্মাণে নারীর কোনো ভূমিকাই হয়তো ছিল না। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? না কি, ইতিহাস নির্মাণে অপরিসীম ভূমিকা রাখার পরও সচেতনভাবে নারীদের কথা অবহেলায় অনুচ্চারিত রাখা হয়েছে পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে?

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নারী ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করে নিতে পারি:

নভেরা আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম নারী ভাস্কর। ভাস্কর্য শিল্পে অবদানের জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'একুশে পদক'। তিনি আরেক শিল্পী হামিদুর রহমানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা তৈরিতে কাজ করলেও তার অবদানের কথা মনে রাখা হয়নি। তার মৃত্যুর পর জাতীয় শহীদ মিনারের 'রূপকার' হিসেবে হামিদুর রহমানের পাশাপাশি নভেরা আহমেদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে ২০১৫ সালে চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করে নভেরা আহমেদ স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ।

তারামন বিবি (বীরপ্রতীক) বাংলাদেশের খেতাবপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা। অথচ তার নাম জানে না বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই। সালমা খাতুন বাংলাদেশের প্রথম নারী ট্রেনচালক। বাংলাদেশের মেট্রোরেলের প্রথম চালক মরিয়ম আফিজা। ক্যাপ্টেন সৈয়দা কানিজ ফাতেমা রোকসানা বাংলাদেশের সরকারি বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর প্রথম নারী বৈমানিক। বাংলাদেশ পুলিশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রাপ্ত রৌশন আরা বেগম প্রথম নারী পুলিশ সুপার হিসেবে মুন্সীগঞ্জ জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে প্রথম নারী মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়া ব্যক্তি হলেন ডাক্তার সুসানে গীতি। তাদের নাম কতোজনের জানা?

আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাক: বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র নারী সদস্য বেগম রাজিয়া বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষার্থী লীলা নাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষক করুণাকণা গুপ্ত, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম নারী অধ্যক্ষ ডা. হোসনে আরা তাহমিন, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য ফারজানা ইসলাম কিংবা প্রতিষেধকবিদ্যা ও সংক্রামক রোগ নিয়ে

গবেষণাকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী। তাঁদের নামও নিজেদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে তাদের পুরুষ সহকর্মী বা সহচরদের মতো এতো ঢালাওভাবে প্রচার পায় না।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকজনের কথা যদি বলা হয়: দু'বার নোবেল পুরস্কার জয় করেন বিজ্ঞানী মাদাম মারি কুরি; ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এবং ১৯১১ সালে রসায়নে। এছাড়া শান্তিতে নোবেলজয়ী শিরিন এবাদি, নারীদের যৌনাঙ্গ কর্তনের (ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন) বিরুদ্ধে কাজ করে পুরস্কৃত হওয়া সোমালিল্যান্ডের লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট নিমকো আলী, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের প্রথম পেশাদার নারী ফটোগ্রাফার এবং একাধারে শিল্পী ও অ্যাক্টিভিস্ট বুশরা ইয়াহইয়া আলমুতাওয়াকিল, প্রথম নারী নভোচারি ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম নারী নভোচারী কল্পনা চাওলা। রয়েছেন অস্কারজয়ী চলচ্চিত্রনির্মাতা ক্যাথরিন বিগেলো।

শক্তিমান এমন নারীদের মধ্যে আরও রয়েছেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, ভারতবর্ষের প্রথম নারী শাসক হিসেবে স্বীকৃত সুলতানা রাজিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ও একমাত্র নারী নওয়াব এবং নারীশিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের নাটোরের জমিদার রাণী ভবানী। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশেই রাষ্ট্র বা সরকারের প্রধান কিংবা রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবেও অনেক নারীর নাম নেওয়া যাবে।

অথচ দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করা বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পরও কীর্তিমান এই নারীদের নাম অনেকের কাছে অপরিচিত। এর একটি বড় কারণ হলো তাদের নিয়ে বড় পরিসরে বা নিয়মিত কোনো আলোচনা নেই। শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-ব্যবসা-রাজনীতি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ক্রীড়া-সামরিক বাহিনীসহ নানা ক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবুও, যেখানে যতোটা সম্ভব নারীর উপস্থিতিকে ছাপিয়ে পুরুষের উপস্থিতিকে সরব করে তোলা হয়েছে।

তাদের মতোই বর্তমানে আরও অনেক নারী নানা পেশা বা সমাজের নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। নারীদের এই কর্মযজ্ঞ, বাধা পেরিয়ে এগিয়ে আসা বা সফলতার গল্পগুলো পুরুষের অর্জনের গল্পের মতো সমাজে প্রাধান্য পায় না; নারীদের গল্পগুলো খুব অবহেলায় বা ছোট পরিসরে পারিবারিক আয়োজনে আলোচিত হয় অথবা খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় ছোট্ট এক কোণে ঠাঁই পায়।

ইতিহাসের গল্প বলার মধ্যে পুরুষের প্রতি এমন পক্ষপাত মূলত নারীর তুলনায় পুরুষকে সবল, সরব ও মহত্তর করে তোলার পুরানো কৌশলেরই অংশ। নারীর অবদানের কথা কম বলার মধ্য দিয়ে সহজেই সমাজ ও সভ্যতায় নারীর ভূমিকাকে

অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন করা যায়। বৈষম্যমূলক এই 'স্টোরিটেলিং' এবং এমন সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ সব অর্জনের প্রতিনিধি হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই পুরুষকে ভাবতে শেখে। এ কারণেই কোনো বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড় বা বৈমানিকের নাম জানতে চাইলে সবার মন অনিবার্যভাবেই একজন পুরুষের মুখচ্ছবির সন্ধান করতে শুরু করে।

ইতিহাসে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উহ্য রাখার এই ধারাবাহিকতার ঠিক এখানে এবং এখনই ছেদ টানা দরকার; না হলে পুরুষনির্ভর ইতিহাসের ধারণাও কখনো বদলানো সম্ভব হবে না। এভাবে কখনোই সমাজ বদলাবে না; যে বদলটা আমরা অনেকেই দেখতে চাই, তা নিশ্চিত করতে হলে ইতিহাসের ভাষ্য নির্মাণের এমন ধারাটিও বদলাতে হবে।

খণ্ডিত বা আংশিক কিংবা পক্ষপাতমূলক নয়– ইতিহাস হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও নির্মোহ। তাহলেই কেবল সেই ইতিহাস হবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। সেই ইতিহাসই হবে সামাজিকীকরণের নির্ভরযোগ্য অনুঘটক।

সাবিরা নুপুর*

কন্যাশিশু: বর্তমান পরিস্থিতি এবং করণীয়

অনেক বছর আগে আমি এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। প্রায়শ আমাকে বিভিন্ন গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করতে যেতে হতো। একদিন একটি গ্রামে কার্যক্রম পরিদর্শনে যাওয়ার পথে অসাধারণ সুন্দর এক কন্যার সঙ্গে দেখা হয়। সে শাড়ি পড়েছিল। বয়স আনুমানিক ৮/৯ বছর হবে। আমি তাকে জিঙ্গেস করেছিলাম, শাড়ি পড়েছো কেন? উত্তর ছিল: 'আমার বিয়া হইছে'। যদিও আমরা শিশুর বিয়ের হার কমিয়ে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনো ৫১ শতাংশ শিশুকে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে। এদের বেশিরভাগই কন্যাশিশু। বিয়ে হওয়ার পরপরই এসকল কন্যাশিশুরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে, অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান করছে, যা তাকে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলছে। তারা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তথ্যপ্রবাহে যেহেতু বিবাহিত কন্যাগণ থাকতে পারছে না, ফলে তাদের জ্ঞানার্জন ব্যাহত হচ্ছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় ছাত্ররা যখন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করছিল, তখন আমরা দেখেছিলাম একটি পরিবার তাদের বাসার কাজে সহযোগিতা করে যে কন্যাটি তাকে গাড়ির পেছনে বসানো হয়েছে। যেটা বসার জায়গা ছিল না। এর আগেও আমরা দেখেছি বাসাবাড়িতে কর্মরত অনেক কন্যাশিশুকে অমানবিক অত্যাচারের পর হত্যা করা হয়েছে। বাসাবাড়িতে কর্মরত কন্যাদের ভোর হতে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তাদেরকে দিয়ে ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয়। পর্যাপ্ত খাবার ও বিশ্রাম করার সময় বা সুযোগ কোনোটাই নিশ্চিত করা হয় না। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০২২ অনুযায়ী, দেশে বাসাবাড়িতে কর্মরত শিশুর সংখ্যা দুই মিলিয়নের বেশি। যাদের বয়স সাত থেকে ১৭ বছর এবং বেশিরভাগই কন্যাশিশু। এই সংখ্যক কন্যাশিশুর অনেকেই অবৈতনিক হিসেবে কাজ করে থাকে। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া অপরাধ বলে গণ্য হবে।

* অ্যাডভোকেসি এবং কমিউনিকেশন প্র্যাকটিশনার

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কন্যাশিশুর প্রতি সহিংতা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের মিডিয়া পর্যবেক্ষণে দেখিয়েছে যে, শুধু ২০২৪ সালের মার্চ মাসেই ৪১ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের ও ১২ জন কন্যশিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এই তথ্য আমাদের দেখিয়েছে যে, আমাদের কন্যাশিশুরা কোথাও নিরাপদ নয়। অনিরাপত্তার কারণে কন্যাশিশুদের নির্বিঘ্ন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। কন্যাশিশুদের চিত্ত-বিনোদন ও খেলাধুলাও সীমিত আকার ধারণ করছে।

উপরের চিত্রের পাশাপাশি আমরা ইতিবাচক উত্তরণও দেখছি। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০২৩ অনুযায়ী, মাধ্যমিকে মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৫৫ শতাংশই কন্যাশিশু। কারিগরি শিক্ষায় মাত্র ২৯ শতাংশ। কন্যাশিশুর শিক্ষার উন্নয়নে বিগত সরকারের আমলে আমরা কিছু উদ্যোগ দেখেছি, কিন্তু সেই উদ্যোগগুলো সামগ্রিকভাবে কন্যাশিশুর জীবনযাত্রায় বা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে দেখছি না।

সমাজের আয়ভিত্তিক বৈষম্য, নারা-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের সীমাবদ্ধতা কন্যাশিশুর অবস্থানগত দিকগুলো আরও সঙ্গীন করে তুলেছে।

বাংলাদেশে ১৪.৪ মিলিয়ন কন্যাশিশু রয়েছে। তাদের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার-সহ সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন:

♦ কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। এদের সবার সমন্বিতভাবে কাজ করা জরুরি। অভিভাবকগণকে এই সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

♦ আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা আরও জোরদার করা দরকার, যাতে করে কন্যাশিশুরা নিরাপদবোধ করেন এবং সমাজে নির্বিঘ্নে এবং ভয়ভীতি ছাড়া চলাচল করতে পারেন। অভিভাবকগণও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবের কারণ দেখিয়ে তাঁদের কন্যাদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে পারেন।

♦ বিচারব্যবস্থাকে আরও শিশুবান্ধব বিশেষ করে কন্যাশিশুবান্ধব করতে হবে। যাতে করে যখনই কোনো কন্যাশিশু সহিংসতার শিকার হবে, তখনই তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার পেতে পারে।

♦ কন্যাশিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা দেশ ও দেশের বাইরে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠতে পারে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রমগুলি একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, বাজেট ও জনবল বরাদ্দ করতে হবে

♦ কন্যাশিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরো জোরদার করা প্রয়োজন। এছাড়াও কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে বাংলাদেশ সরকার এবং এনজিওসমূহ সমন্বয়ের মাধ্যমে একইসঙ্গে দেশব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

♦ একইসঙ্গে এনজিওসমূহের মধ্যেও আরো সমন্বয় প্রয়োজন।

সুব্রত ব্যানার্জী*

বিশ্ববিদ্যালয় পরিমণ্ডল কেন যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে?

যেখানে সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র‍্যাংকিং, গবেষণা, উদ্ভাবন ও মৌলিক জ্ঞান দৃষ্টির খবরে আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় গণমাধ্যমে নজর কাড়ে, সেখানে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২০২৪ সালে আলোচনায় এসেছে নারী শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের সংবাদের কারণে।

২০২৪ সালে গত কয়েক মাসে বিশ্ববিদ্যালয় পরিমণ্ডলে ঘটে যাওয়া নারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনার মাঝে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দম্পতিকে ডেকে এনে স্বামীকে আবাসিক হলে আটকে স্ত্রীকে ধর্ষণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের অভিযোগ ছাত্রীর, এই ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্য! সর্বশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী অবন্তিকার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির ও নিপীড়নের বিষয়টি আবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের নিপীড়নের ঘটনাগুলো নতুন কিছু নয়, বিগত ১০-১৫ বছর ধরে ঘটেই চলেছে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে বলাই যেতে পারে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠগুলো কেন নারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের 'হটস্পট' হয়ে ওঠেছে? কখনো সহপাঠী দ্বারা, সিনিয়র শিক্ষার্থী দ্বারা, শিক্ষক দ্বারা, সহকর্মী দ্বারা, বহিরাগত দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষিকারাও যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, আবার কখনো বহিরাগত নারীকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এনে ধর্ষণের মত ঘটনাও ঘটে চলেছে।

*** পিএইচডি গবেষক, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষক, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়**

অপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় 'অপরাধের হটস্পট' বলতে বোঝায় হঠাৎ কোনো জায়গা, প্রতিষ্ঠান বা পরিধিতে নির্দিষ্ট কোনো অপরাধের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়াকে। যেখানে সবাই মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দেশের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীরা সেখানে অধ্যয়ন করবে, শিক্ষকতা করবেন দেশের মেধাবী ব্যক্তিরা–যাদের মনে করা হবে উন্নত চিন্তা-চেতনা-রুচি-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের আলোকবর্তিকা হিসেবে। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই কেন আজ যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের হটস্পটে পরিণত হয়েছে?

অপরাধবিজ্ঞানে শিক্ষকতা: বাংলাদেশের নারীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন নিয়ে দেশে, কানাডায় ও অস্ট্রেলিয়াতে বর্তমানে পিএইচডি গবেষণায় বাংলাদেশের নারীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতার নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয়েছে, দেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রতিষ্ঠানে নারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনাগুলোকে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি, নেওয়া হয়নি রাষ্ট্রীয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ। যার ফলে যত দিন যাচ্ছে এই ধরনের ঘটনা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের 'হটস্পট' হিসেবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওঠে আসার পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলোকে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

ভিকটিম-অভিযুক্তের ক্ষমতার পার্থক্য: কোনো শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অভিযোগ করেন, তখন দায়িত্বে থাকা শিক্ষক বা প্রশাসন আগে দেখেন অভিযুক্তের ক্ষমতার পরিচয়। অভিযোগকারী যদি কোনো ক্ষমতাসীন দলের শিক্ষার্থী হয়ে থাকেন, তাহলে সেই ঘটনার বিচার করতে প্রক্টর অফিস, প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র গড়িমসি করে। এছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে সেখানেও উক্ত শিক্ষকের পেশাগত অবস্থানের কারণে বেশিরভাগ অভিযোগ আলোর মুখ দেখে না। এছাড়া নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে ছাত্রীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ জানাতে হয় পুরুষ শিক্ষকের কাছে। লক্ষ করলে দেখবেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কোনো নারী প্রক্টর থাকেন না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রক্টরিয়াল বডিতে নারী শিক্ষিকাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। বাংলাদেশের সমাজে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক ও ক্ষমতাগত পার্থক্য ও বৈষম্যের কারণে পুরুষ শিক্ষকরাও এসব ঘটনার সংবেদনশীলতা উপলব্ধি করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হন।

অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয়: সাম্প্রতিক অবন্তির ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত নারীকে ধর্ষণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা বিবেচনা করলেও দেখা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পরিচয়কে ব্যবহার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক দল করলেই সেই

'আইডেন্টিটি' ব্যবহার করে প্রভাব খাটানো যায় খাবারের ক্যান্টিন থেকে শুরু করে ক্লাসরুমে, র‍্যাগিংসহ নারী নির্যাতনের মত ঘটনা ঘটানো যায়। এই ধরনের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে এখন অনেক ক্যাম্পাসে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানির কিছুদিন আগের ঘটনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অপরাধী তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে নিজেকে প্রভাবশালী মনে করেন, ভাবেন তিনি যাই করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তার বিচার করবে না। অবন্তীর ঘটনায় ওঠে এসেছে যে অভিযুক্ত প্রায়ই অবন্তীকে বলতেন তিনি অমুক শিক্ষকের রাজনীতি করেন। তাই অভিযোগ করেও কোনো লাভ হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির অনুকূল পরিবেশ: অপরাধবিজ্ঞানে 'রুটিন অ্যাকটিভিটি' নামে একটি তত্ত্ব রয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তু হলো সম্ভাব্য অপরাধী তার অপরাধ সংঘটনের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে উপযুক্ত সময়, স্থান এবং নজরদারিতে থাকা ব্যক্তি বা উপকরণের অনুপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয় জায়গাটি এমন একটি অরক্ষিত জায়গায় পরিণত হয়েছে যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কোনো নারী শিক্ষার্থীকে রাস্তা-ঘাটে, শ্রেণিকক্ষে যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানিমূলক উক্তি করলেও দেখার কেউ নেই।

এছাড়া অপরাধীরা বুঝে গেছে এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ বা যৌন হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেভাবে গণ্য করা হয় না। হুমকি দিলেই ভিকটিম বিষয়টি চেপে যাবে, আবার অভিযোগ করলেও ব্যাপারটি মীমাংসা করা হবে, অথবা অভিযোগের পর আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি করলে সাধারণ পুলিশি ঝামেলারও সম্মুখীন অভিযুক্তকে হতে হবে না।

বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চত্বর, রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি লাগানো আছে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রক্টর অফিস সেসব সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ করেন। বিষয়টি শিক্ষার্থীরাও জানেন, আবার বহিরাগতরাও জানেন। যার ফলে তারা কোনো ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার সময় মাথায় রাখেন না যে তাদের কেউ নজরদারি করছে। আমি যেহেতু নিজ ক্যাম্পাসে দীর্ঘদীন শিক্ষকতা করেছি, দেখেছি বেশিরভাগ সিসিটিভিই অচল অথবা দীর্ঘদীন ধরে মাকড়সার জালবেষ্টিত হয়ে অকেজো।

অভিযোগ কোথায় জানাবেন জানেন না শিক্ষার্থীরা: অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জানেন না তাদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা কোথায় জানাবেন, কীভাবে জানাবেন, কখন জানাবেন? এর মূল কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা শিক্ষকরাও কখনো এ বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী জানবেন কোন কোন ঘটনা যৌন হয়রানির অন্তর্গত, ভুক্তভোগী কীভাবে ও কোথায় তার অভিযোগ জানাবেন। অথচ

অস্ট্রেলিয়া-সহ সারা বিশ্বেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির বিষয়ে আলাদা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিটি থাকে, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময়েই ই-মেইলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি বইয়ে জানানো হয়। হয়রানির শিকার নারীদের শারীরিক ও মানসিক সাপোর্ট দেওয়া হয়, সচেতনামূলক প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে এবং এসব ঘটনাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ ও ভিক্টিম ব্লেমিং: যৌন হয়রানির শিকার নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং ভিকটিম যেন সামাজিক দোষারোপের কারণে মানসিক ট্রমাতে না ভোগেন, এসব বিষয় গুরুত্ব রেখেই সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষার্থীদের পরিচয় গোপন রাখা হয়। অথচ আমাদের দেশে কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার হয়রানির ঘটনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভিকটিমের নাম-পরিচয় ও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিচারের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে দেন। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী অভিযুক্তের কাছ থেকে হুমকি ও পরবর্তী হয়রানি, অনেকসময় সহপাঠী বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিমণ্ডলের অন্যান্যদের কাছ থেকে তিরস্কার বা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। অনেক সময় যে ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন তার দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। যেমনটি ঘটেছে অবন্তীর ক্ষেত্রেও, বিচারের আশায় সহকারী প্রক্টরকে জানালেও উল্টো অবন্তিকাকে দোষারোপ করেছেন উক্ত অভিযুক্ত শিক্ষক। এভাবেই ব্লেমিংয়ের শিকার হয়ে ও নিরাপত্তার অভাবে আত্মহননের পথ বেছে নেন অবন্তিকা।

এসব কারণে বেশিরভাগ নারী অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হন। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতনের শিকার হয়ে চুপ করে থাকেন। অপরাধের ভাষায় যাকে বলে 'ডার্ক ফিগার অব ক্রাইম'। যার মানে অপরাধ সংঘঠিত হবে, কিন্তু রিপোর্টেড হবে না। উদাহরস্বরূপ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল আলীমের ২০২৩ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুরুষতান্ত্রিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের কৌশল (স্ট্র্যাটেজিস ফর প্রিভেন্টিং মাসকুলিনিটি অ্যান্ড জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইন হায়ার অ্যাডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ: আ স্টাডি অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি)' শীর্ষক গবেষণার ফলাফলে ৯২ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী জানান, ন্যায়বিচার না পাওয়া ও চরিত্র হননের ভয়ে তারা সেলে অভিযোগ করেননি (সূত্র: প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০২৩)। এ কারণে আমরা আসলে বলতে পারব না যে এ ধরনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বিগত বছরেও ঘটেনি।

শিক্ষকদের নজরদারি ও প্রশিক্ষণের অভাব: সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে অনেক নারী শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের কাছ থেকে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়া, শিক্ষাজীবন নষ্ট করার হুমকি দিয়ে এসব ঘটনা গোপন রাখতে বাধ্য

করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। অস্ট্রেলিয়াতে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগের সময়ই তাদেরকে তাদের চাকরি বিধিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, নৈতিকতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের পরিধি, যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ, একইভাবে শিক্ষার্থীরা কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে গেলে তাকে আগেই নৈতিকতা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হয়। কোনো শিক্ষক বা গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হলে কীভাবে ও কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে বিস্তারিত শেখানো হয়ে থাকে। এসব ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যার ফলে শিক্ষকদের মধ্য ভীতি ও সচেতনতা থাকে এসব ব্যাপারে। অথচ আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এসব কিছুই শেখানো হয় না। একজন শিক্ষক মানেই তিনি অপরাধী হতে পারেন না বা শিক্ষার্থীরা তার কাছে সবসময় সুরক্ষিত– এই ধারণা থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে। কারণ সম্ভাব্য অপরাধী যে কেউ হতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের অকার্যকারিতা: সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন রোধে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র' রয়েছে। কিন্তু নির্যাতনের শিকার ছাত্রী বা নারী শিক্ষকেরা সেখানে অভিযোগ দিতে চান না। কারণ সবাই জানেন এই কমিটি সময়মত ঘটনার বিচার করেন না, সঠিকভাবে ঘটনা আমলে নেন না এবং বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাদের ধারণা কম। সত্যি বলতে অনেক শিক্ষকরাও জানেন না বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের একটি কমিটি রয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করাও হয় না। এই কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সদস্যদের দেওয়া হয় না যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন ঘটনার বিচারপদ্ধতি বিষয়ে কোনো একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।

প্রচলিত শাস্তির বিধান নেই: যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০১০ অনুযায়ী, অপরাধের মাত্রা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৌখিক বা লিখিতভাবে সতর্ক করা, ১-২ বছরের বহিষ্কার (শিক্ষার্থী), চাকরিচ্যুত, প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত রাখা, অর্থদণ্ড দেওয়া (শিক্ষক ও কর্মচারী) এবং ক্যাম্পাসে চলাচল নিষিদ্ধ (বহিরাগত) করার বিধান রয়েছে। অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ অনুসারে যৌন হয়রানি একটি 'ফৌজদারি অপরাধ' এবং শাস্তির বিধান রয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যৌন হয়রানির বিচার সামান্য মৌখিক বা লিখিতভাবে সতর্ক করা বা বহিষ্কার (শিক্ষার্থী), চাকরিচ্যুত, প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত রাখার মধ্যই সীমাবদ্ধ। যদিও সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক সাদেকা হালিমের তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সন্দেহভাজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে গ্রফতার করা হয়েছে, ব্যাপারটি ইতিবাচক ও ঘটনার ব্যাপারে উপাচার্যের সংবেদনশীলতা প্রশংসনীয়।

বিচারহীনতার সংস্কৃতিঃ অপরাধবিজ্ঞানে 'ডেটারেন্স থিওরি' নামে একটি তত্ত্ব রয়েছে যার মূল বক্তব্য হলো বিচারহীনতা ও শাস্তির অপ্রতুলতা অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। শুধু বৃদ্ধিই করে না, অন্যদের একই ধরনের অপরাধ করতে উৎসাহিত করে। লক্ষ করলে দেখবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া যৌন নিপীড়নের বিচার হয়েছে এমন উদাহরণ খুবই কম। আবার কোনো ঘটনার বিচার হলেও বিচার হতে হতে অভিযুক্তের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন হয়ে যায়, আবার বছরের পর বছর এসব বিচার টিউবলাইটের মত চলতে থাকে। ঠিক এই কারণের অবন্তিকার মত মেধাবী শিক্ষার্থীরাও আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠেন।

সুতপা বেদজ্ঞ*

নবযাত্রার পথে বাংলাদেশ, নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রশ্ন

দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সবক্ষেত্রে বৈষম্যের বেড়াজালে আটকে আছে। ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যবসায়ী পুঁজিপতি তোষণ নীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা সংকটের মুখে। এ দেশে অধিকারবঞ্চিত সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলেও সরকারের দমন নীতির কারণে কথা বলার বা প্রতিবাদ করার সাহস তাদের নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি ব্যবস্থা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বই দেয় না। এমনই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ মানুষ সময়ের অপেক্ষায় ছিল। ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়েছিল তা ক্রমে বিস্ফোরিত হয়ে ছাত্র-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই গণঅভ্যুত্থান স্বপ্নহীন মানুষগুলোর সামনে নতুন করে স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে।

আজকের বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরে এক নতুন সম্ভাবনার পথে যাত্রা শুরু করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এই সময়ে এদেশের শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিকদের শ্রেণিবিভাগ থাকলেও নারী শ্রমিক-পুরুষ শ্রমিক আলাদা করা হয়নি। ২০০৬ সালে শ্রম মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে শ্রম আইনের সংশোধন করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৮ সালে আরেক দফা শ্রম আইন সংশোধন করা হয়। ২০২৩ সালে সংশোধিত শ্রম বিধিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এতবার সংশোধনের পরেও বাংলাদেশ শ্রম আইন শুধু প্রাতিষ্ঠানিক খাত ও সেই খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়া মজুরি কমিশন, চা শ্রমিকদের জন্য চা বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যে মজুরি নির্ধারণ করা হয়। শ্রমিকদের একটি ব্যাপক অংশ দিনমজুরির সঙ্গে যুক্ত

* লেখক ও অধিকার কর্মী

থাকলেও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে গঠিত বিভিন্ন কমিশন, বোর্ড বা শ্রম আইন এসবের কোথাও দিনমজুর শ্রমিকদের বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

শ্রম সংগঠনগুলোর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ৬ কোটি ৩৫ লাখ কর্মরত শ্রমিক রয়েছে। গত দুই দশক জুড়ে সরকারি কল-কারখানা ব্যাপক হারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের সংজ্ঞাও পাল্টেছে। বিভিন্ন তথ্যমতে, প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের বেশি নয়। অধিকাংশ শ্রমজীবী এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত। নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, গৃহকর্মে যুক্ত শ্রমিক, কৃষিখামার, জাহাজভাঙ্গা, কাঠশিল্প, ওষুধশিল্প, পাটশিল্প, চা শিল্প, দিনমজুরসহ অসংখ্য পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক যারা কায়িক পরিশ্রম করে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু মজুরি যা পায় তা দিয়ে জীবন চলে না। তাদের সংগঠনের অধিকার নেই, বিশ্রামের সময় নেই, স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা নেই, আর বিনোদন তো দূরের কথা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতরা যেখানে সাধারণত পাঁচজনের কম শ্রমিক কাজ করেন তারা শ্রম আইনের আওতার বাইরে। এছাড়া এখনও অনেক বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা শ্রম আইন নির্ধারিত সুরক্ষা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে নারী শ্রমিকেরা শ্রমিক হিসেবে বঞ্চিত এবং কেবল নারী হওয়ার কারণে বিশেষভাবে বঞ্চিত।

শ্রমিক বলতে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমজীবীকে বোঝালেও মজুরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দিনমজুরিতে এখনো নারী পুরুষের সমান মজুরি পায় না। অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীদের বিশেষ চাহিদা অর্থাৎ পিরিয়ড বা শিশুদের দুধপান করানোকে নারীদের দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ইটভাঙ্গা, ইট উত্তোলন, বহুতল ভবন নির্মাণ বা রাস্তা-ড্রেন-সেতু ইত্যাদি নির্মাণের মতো ভারী কাজের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান কাজ করলেও তাদের মজুরি পুরুষের তিনভাগের দুইভাগ। যে সকল নারী বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কঠিন গৃহস্থালি কাজ সমাধা করে তাদের জন্যও শ্রম আইনে কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। মজুরি বা কর্মঘণ্টার কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। গৃহকর্মীদের মজুরি নির্ভর করে গৃহকর্তাদের মর্জির ওপর।

বাংলাদেশে মোট ২৪০টি (ফাঁড়ি বাগান-সহ) চা বাগানে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। নারীর শ্রমে-ঘামেই আজ চা শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ এই শিল্পের শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির সময়ে তাদের দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা। এই মজুরিও সব বাগান মালিকেরা ঠিকমত পরিশোধ করে না। অভিযোগ রয়েছে অনেক বাগানে এখনো নারীদের ১২০ টাকা মজুরি প্রদান করা হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের হিসাব অনুযায়ী, পোশাক খাতে কর্মরত ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিকের মধ্যে ২৭ লাখ ৮৮

হাজার ৬১৬ জন নারী শ্রমিক। পোশাক খাত বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি খাত হওয়া সত্ত্বেও এই খাতে এখনও পর্যন্ত মজুরি ও কর্মক্ষেত্রে মানসম্মত সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। শ্রমিকেরা তাদের দাবি আদায়ে কারখানা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে আসে।

দেখা যাক সংবিধান, শ্রম আইন ও নীতিমালায় কী রয়েছে।

রাষ্ট্রের আইন ও বিধিমালা তৈরি হয় সংবিধানের আলোকে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান'।

শ্রমের অধিকার সম্পর্কে সংবিধানের ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন'। সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার কথা বলা আছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে– সংবিধান প্রদত্ত বিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

জাতীয় শ্রম নীতিমালা-২০১২-এর লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।'

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ১০৩ ধারায় নারী শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারণ করা আছে। রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কাজ করাতে হলে নারীদের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। ৬৩ ধারায় বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী শ্রমিক ৩০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের দ্রব্য কারো সাহায্য ছাড়া হাতে বা মাথায় উত্তোলন, বহন, অপসারণ করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এছাড়া শ্রম আইন-২০০৬ এর ৪৫ ও ৪৬ ধারায় প্রসূতিকালীন ছুটি ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে।

সংবিধানের উপরোক্ত বিধানাবলি ও বিভিন্ন বিধিমালা-নীতিমালার আলোকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশের বিদ্যমান শ্রম আইনে ঐ সকল বিধানাবলি ও নীতিমালার প্রতিফলন নেই। শ্রম আইন সকল শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি

নিশ্চিত করতে পারছে না। জাতীয় নীতিমালাসমূহের ঘোষণা কেবল কাগজেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে শ্রম বিধিমালা লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। শ্রম বিধিমালায় যাই-ই থাকুক না কেন মালিকেরা বিশেষ করে পোশাকখাতে কেবল বিদেশি ক্রেতাদের চাপে কিছু কিছু কর্মপরিবেশ উন্নত করার উদ্যোগ নিলেও তা এখনো যথেষ্ট নয়। এ নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের দিক থেকে তাগিদ না থাকার কারণে কারখানার মালিকেরা যথেচ্ছাচার করে থাকেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা কখনোই নিরাপদ ছিল না, আজও নেই। শিল্পবিপ্লবের পর শ্রমিক বলতে শুধু কল-কারখানায় কাজ করা শ্রমজীবী মানুষকে বোঝানো হতো। একথা সত্য একসময় পৃথিবীতে কোনো মালিক ছিল না। যখন শ্রমই ছিল সব মানুষের পেশা। ধীরে ধীরে দাসপ্রথা এল। মালিক-শ্রমিক তৈরি হলো। সামন্ত ও বর্তমান পুঁজিবাদ দাস ব্যবস্থারই মোডিফায়েড রূপে শ্রমিককে মজুরি কম দিয়ে এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে উদ্বৃত্তমূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে চলেছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে আইন আছে, আদালত রয়েছে। এমনকি শ্রমিকেরা অন্যায্যতার শিকার হলে তার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম আদালত পর্যন্ত রয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকেরা বঞ্চিত হয়েই চলেছে। কারণ মুনাফা ও মজুরির দ্বন্দ্ব-বিরোধে শ্রমিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অসংগঠিত, এজন্য দুর্বল ও শোষিত। আগ্রাসী পুঁজিবাদ সমাজে ভোগের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে। শ্রমিকদের শোষণ করে অর্থবিত্ত তৈরি করে, সেই সংস্কৃতির একমাত্র ভোক্তা পুঁজিপতি। মালিকের অন্যায্য আচরণ রুখতে হলে, শোষণমুক্ত সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই সংবিধানের মূল স্পিরিটের কাছে ফিরে যেতে হবে।

কৃষক-শ্রমিক-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মেহনতি মানুষের রক্তে-ঘামে অর্জিত এ দেশে শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিকেরা যুগের পর যুগ বঞ্চিত হতেই থাকবে, সমাজে মজুরি বৈষম্য টিকে থাকবে তা হতে পারে না। একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন খাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও নিয়ম কার্যকর থাকায় শ্রমিকদের মধ্যেও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান শ্রম আইনের ঘাটতি চিহ্নিত করে এটিকে সর্বজনীন শ্রমিকবান্ধব ও নারীবান্ধব করতে পারলে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করে তাদের রেশনিং ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারলে সমাজে বৈষম্য যেমন কমবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন-যাপনে স্বস্তি ফিরে আসবে। এটি কোনো কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছার।

বর্তমান বাংলাদেশে নবযাত্রার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনার আলো থেকে আমাদের দেশের শ্রমিক এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকেরা যেন কোনোভাবেই বঞ্চিত না হন। এই আলোর পথ ধরেই শ্রমিকেরা আগামীতে যেন বৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন সেদিকে সকল সচেতন মহলের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

সৈয়দা অনন্যা রহমান*

কন্যাশিশুর বঞ্চনা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন শিক্ষা ও আইনের প্রয়োগ

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর ভিত্তিতে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ১৫ লাখ ৯০ হাজার। যেখানে নারী ৮ কোটি ৭৩ লাখ ৯০ হাজার এবং পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ। অর্থাৎ দেশের পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৩১ লাখ ৯০ হাজার বেশি। পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ নারী। এই অংশকে পেছনে ফেলে রেখে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, সুযোগ, অধিকার ও সম্মান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১৯৭০-৭১ সালে দেশের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ছিল ২৮ শতাংশের কিছুটা বেশি। ২০১৯ সালে, প্রাথমিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীর হার প্রায় ৫১ শতাংশে উন্নীত হয় । ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, চিকিৎসা, আইন, কৃষি ও শিক্ষা-সহ দেশের পেশাগত শিক্ষায় যত শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন তার মধ্যে ৬১ শতাংশের বেশি নারী। নারীদের শিক্ষার স্তরের উন্নয়ন স্বাস্থ্য অর্থনীতি তথা সার্বিক ভবিষ্যতের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। যেসকল মায়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছে নিরক্ষর মায়েদের তুলনায় সে সকল মায়েদের শিশুমৃত্যু হার অর্ধেক।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত নারী আসনে ৫০ হাজারের অধিক নারী নির্বাচিত হন। কিন্তু মর্যাদা, মতামত গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা এখনো অবহেলিত। পরিসংখ্যান অনুসারে, আমাদের দেশে নারীরা এখনো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসার জন্য প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা

* বিভাগীয় প্রধান, স্বাস্থ্য অধিকার বিভাগ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

হয়। নারীর অগ্রগতি ও নেতৃত্ব প্রত্যাশা করলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের যথাযথ মর্যাদা, সম্মান ও মূল্যায়ন দেওয়া খুব প্রয়োজন।

সংকটের সময় নারীরা দক্ষ নেতা হিসেবে প্রমাণিত। ১৯৪টি দেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারী নেতৃত্বাধীন দেশগুলোতে মহামারির প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিগতভাবে ভালো ছিল। নারী গভর্নরের নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলোতে কোভিড-১৯ জনিত মৃত্যুর সংখ্যা কম ছিল। নারীনেত্রীবৃন্দ কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা, উদ্যোগ নেওয়া, অন্যদের বিকশিত করা এবং শক্তিশালীভাবে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে পারেন।

নারী স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃত সুস্থতার জন্য একজন পুরুষ এবং নারী উভয়ের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণা দেয়। নিয়মিত খেলাধুলা ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলির প্রকাশ, মেধা বিকাশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। অথচ আমাদের দেশে মাঠ পার্কগুলোতে নারী, কিশোরী, কন্যাশিশুদের খেলাধুলার সুযোগ নেই। সব বয়সীদের জন্য খেলা, বিনোদন এবং শরীর চর্চার উপযোগী মাঠ পার্ক থাকা খুব প্রয়োজন। পেশা হিসেবে মেয়েরা খেলাধুলায় সম্পৃক্ত হতে চাইলে আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সুযোগ অনেক কম। আর্থিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, লিঙ্গবৈষম্য, পরিবারের বিরোধিতা, নারীদের বিশেষায়িত ক্লাব না থাকা, নিয়মিত টুর্নামেন্ট না হওয়া এবং অনুশীলনের জায়গার অভাব ইত্যাদি ।

গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একজন নারী গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৬ ঘণ্টা কাজ করে। শহরের তুলনায় গ্রামের নারীদের কাজের ধরন এবং ব্যাপ্তি বেশি। ইউনাইটেড ন্যাশন্স সিসটেইম অব ন্যাশনাল একাউন্টস (আইএনএসএনবি) এর তথ্যানুসারে, নারীরা বিভিন্ন অফিস বা কারখানায় যখন অর্থের বিনিময়ে কাজ করে শুধু তখনই তাদের শ্রমকে গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্টের (জিডিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের ২০১৩ সালের এক গবেষণা অনুসারে, গৃহিণীরা বিনামূল্যে যেসব গৃহস্থালি কাজ করেন সেগুলোর আনুমানিক মূল্য বছরে ২২৭.৯৩ বিলিয়ন থেকে ২৫৮.৮২ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে দেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২ হাজার ৪৬৯ দশমিক ৫৮ ডলার। ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (এমজিআই) এর প্রতিবেদন অনুসারে নারীর সমতাকে উন্নত করা হলে জিডিপি বৃদ্ধি পায়।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে ধরেই নেওয়া হয় গৃহস্থালির কাজ, অসুস্থদের সেবা যত্ন, সন্তান লালন পালন শুধু নারীদের দায়িত্ব। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এসকল কাজের মূল্যায়ন না থাকায় নারীরা নিজেরাও গৃহস্থালি কাজগুলোকে সেভাবে সম্মান করে না এবং কোনো কাজ মনে করে না। উন্নত দেশগুলো পারিবারিক কাজগুলোকে

সমতার ভিত্তিতে করার পক্ষপাতি। কিউবায় স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের বাড়ির কাজে সাহায্য করতে বাধ্য করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ, কিউবায় 'Hubby, wash the dishes' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে কোনো স্ত্রী যদি অভিযোগ করে যে তার স্বামী বাড়ির কাজে সহযোগিতা করে না সেক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে । রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করলে তার যথাযথ অধিকার, মর্যাদা ও মূল্যায়নের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল হবার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার না থাকা। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সাম্যের সঙ্গে সমতার কথা বলা হয়েছে। (সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আয় লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ ২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না)। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের দেশের পারিবারিক আইন ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে বিবাহ, খোরপোশ, তালাক, ভরণপোষণ, মোহরানা, সন্তানের অভিভাবকত্ব-সহ অনেক প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিলেও উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো ব্যাখা দেওয়া হয়নি। নারী পুরুষকে সম-অধিকার দিয়ে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা জরুরি। হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈষম্য। দুইভাবে হিন্দু নারীরা সম্পত্তি পেলেও তা শুধু জীবদ্দশায় ভোগ করতে পারে, কিন্তু কাউকে দান করার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধরাও হিন্দু আইন অনুসরণ করে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার আইনটি বৈষম্যহীন।

এক্ষেত্রে নারী আন্দোলন এবং নারী অধিকারভিত্তিক দিবসগুলো পালনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্তত এ দিবসগুলো মনে করিয়ে দেয় নারীর প্রতি বৈষম্যহীনতা ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো। নারীর মানবাধিকার সুরক্ষা কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং মানুষ হিসেবে তাদের অন্যতম ন্যায্য অধিকার। নারীর মানবাধিকার হচ্ছে ন্যায়বিচারের অন্যতম পূর্বশর্ত। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে নারীরা তাদের জন্য প্রদত্ত অধিকারগুলো সমভাবে ভোগ করতে পারে না। চূড়ান্ত বিচারে কমবেশি প্রায় প্রতিটি দেশের প্রচলিত সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্য এবং আইন-কানুন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হওয়ায় তা তাদের মানবাধিকারকে সঙ্কুচিত করেছে । এ দিবসগুলো মেয়েদের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলোকে সমর্থন করে এবং বিশ্বব্যাপী মেয়েদের মুখোমুখি হওয়া জেন্ডার

বৈষম্য অর্থাৎ শিক্ষা, পুষ্টি, আইনি অধিকার, চিকিৎসা সেবা এবং বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জোরপূর্বক বাল্যবিবাহের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে বলতে চাই, রাষ্ট্রের নারীর অধিকার রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো চর্চা করা দরকার। শুধু অপ্রতিবন্ধী নারীদের এ তালিকায় রাখলে বৈষম্য দূর হবে না। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারগুলোও নিশ্চিত করা জরুরি।

সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সমাধানের পথ বের করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শুধু সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসে না থেকে যে যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সমস্যার মোকাবিলা ও সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ তৈরি হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়ক আইন প্রণয়ন জরুরি, তেমনি দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রণীত আইন, যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭, অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রভৃতি আইনের মতো শক্তিশালী আইনগুলোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি।

ফারাহ কবির*

কন্যাশিশুর অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন সমষ্টিগত উদ্যোগ

বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। তবে দেশের উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় কিশোরী মেয়েদের অধিকার সুরক্ষা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী কিশোরী মেয়েদের অধিকার এবং তাদের সুরক্ষার বিষয়টি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের দেশের কিশোরীদের স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে লিঙ্গভিত্তিক অবিচার, সামাজিক কাঠামোগত সহিংসতা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সামাজিক কাঠামোগত সহিংসতা এবং লিঙ্গবৈষম্য

সামাজিক কাঠামোগত সহিংসতা আমাদের সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত, যা প্রায়ই অদৃশ্য থাকে। ২০২১ সালের ব্র্যাকের এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৫৮ শতাংশ কিশোরী তাদের বেড়ে ওঠার সময় কোনো না কোনোভাবে সামাজিক সহিংসতার শিকার হয়। এর একটি প্রধান উদাহরণ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য। অনেক মেয়ে অর্থনৈতিক চাপে কিংবা সামাজিক প্রত্যাশার কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ইউনিসেফের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়েদের স্কুলছুটের হার ছিল ৪২.৮ শতাংশ, যার পেছনে প্রধানত দায়ী ঐতিহ্যগত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা। এই মেয়েরা শুধু শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত হয় না, তারা ভবিষ্যতে আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

বাল্যবিবাহ ও মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ একটি সাধারণ ঘটনা, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০২২ অনুযায়ী, দেশের ৫১ শতাংশ মেয়ের বয়স ১৮-এর নিচে বিয়ে হয়। এর ফলে তাদের শিক্ষার সুযোগ বিনষ্ট

* ফারাহ কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ

হয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহের কারণে কিশোরী মেয়েরা দ্রুত মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়, যা তাদের স্বাস্থ্য এবং সদ্যজাত শিশুটির জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ৪০ শতাংশ কিশোরী মা অপুষ্টির শিকার, যা তাদের পরিবার এবং সমাজের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR)

কিশোরীদের সুষ্ঠু বিকাশ ও ক্ষমতায়নের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরিপের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশ কিশোরী মেয়েই মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায় না, যার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে (তথ্যসূত্র: ব্র্যাক, ২০২১)। কিশোরী মেয়েদের জন্য সঠিক যৌন শিক্ষা এবং গর্ভনিরোধক সুবিধা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এটি তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভাবস্থা থেকে সুরক্ষা দেয় এবং তাদের জীবনে নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে।

নীতিগত সংস্কার এবং সমষ্টিগত উদ্যোগ

কিশোরীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নীতিগত সংস্কার। এতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন এবং মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ উন্নত করার মতো উদ্যোগগুলো অন্তর্ভুক্ত। সরকারের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গসমতার পক্ষে প্রচারে যুক্ত করা প্রয়োজন। এটি একটি সমর্থনমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে, যা মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং তাদের ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করার অন্যতম সেরা উপায়।

মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও ভবিষ্যৎ গঠন

কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের মানে হলো তাদের মতামত শোনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা। ২০২৩ সালের সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৪৮ শতাংশ মেয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদেরকে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিলে এবং সঠিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করলে তারা সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারবে। এখনই সময়, কিশোরী মেয়েদের সম্ভাবনা পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ দেওয়ার। এজন্য আমাদের সবাইকে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে সমাজে প্রতিটি মেয়ে তার স্বপ্নপূরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পায়।

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কর্মরত সমমনা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাজের সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম। কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য এ ফোরাম-এর উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফোরাম উদ্ভবের পটভূমি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু, যার মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু (‘জাতীয় ই-তথ্যকোষ’-এর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ৩৯ লাখ জন কন্যাশিশু)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এদের অধিকাংশই জন্ম থেকে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যকে সঙ্গী করেই বেড়ে উঠছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতায় কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া কন্যাশিশুরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। আমাদের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, কন্যাশিশুরা শুধু ভবিষ্যৎ মা-ই নয়, তারা জাতির সম্পদ। কন্যাশিশুদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও সুরক্ষা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং তাদের সম-অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপরই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই তাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়াই হতে পারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

এই বিশ্বাসবোধ থেকে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও তাদের বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালে সরকারের কাছে কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব করে। এ প্রস্তাবে ৫৪টি বেসরকারি সংস্থা, কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। ফলে ঐ বছরের ৪ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ ঘোষণা প্রদানের জন্য লিখিত প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকার ৩০ সেপ্টেম্বরকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ পালনের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার ফলে ২০০০ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ফলে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে।

এই চেতনাকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ২০০২ সালে 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' গড়ে তোলা হয়।

ফোরাম-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণই ফোরাম-এর লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য:

- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সর্বস্তরে কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে জনমত গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- কন্যাশিশুর সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুকূল নীতি-কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি করা; এবং
- সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবায় কন্যাশিশু ও নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ফোরাম-এর কার্যক্রম:

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' কন্যাশিশুদের সার্বিক জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সমগ্র বাংলাদেশে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে:

ক. অ্যাডভোকেসি: কন্যাশিশু ও নারীর অনুকূল আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ও কর্মশালা পরিচালনা করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ প্রদান: কন্যাশিশুদের জীবনভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

গ. কর্মশালা আয়োজন: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী, সরকারি প্রতিনিধি ও অভিভাবকদের নিয়ে 'কন্যাশিশুর অধিকার ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে 'কন্যাশিশু সম্পদ, বোঝা নয়'– এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি: জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবস পালন, পোস্টার, লিফলেট ছাপানো ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন, রচনা, চিঠি লেখা, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এছাড়া তৃণমূলে উঠান বৈঠক, শোভাযাত্রা, পথনাটক, গান ও অভিভাবক সমাবেশ পরিচালনা করা হয়।

ঙ. আইনি সহায়তা: অ্যাসিড সন্ত্রাস-সহ নির্যাতনের শিকার হওয়া কন্যাশিশুদেরকে ফোরাম-এর সদস্য সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

চ. যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন: নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ফোরাম-এর অর্জনসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ে

নারী-পুরুষের বৈষম্যের সংস্কৃতি আমাদের সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। কন্যাশিশুর প্রতি বঞ্চনা–এই বৈষম্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এর মূলোৎপাটন এবং কন্যাশিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার কাজটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। অল্প সময়ে তাই দৃশ্যমান ফলাফল তৈরি করাটা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মূলত এ কাজটিই করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ফোরাম বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের দশ লক্ষাধিক নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করেছে।

লক্ষণীয় যে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম এখন কন্যাশিশুদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার। প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন টকশো'র আয়োজন এবং কন্যাশিশুদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও প্রদর্শন করায় জনসচেতনতা বাড়ছে। ফলে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠছে। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এবং প্রশাসনের সহায়তায় কয়েক সহস্রাধিক শিশুবিবাহ বন্ধ ও যৌতুকমুক্ত বিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলাফল:

- **জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা:** জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর সরকারের সঙ্গে ফোরাম যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে।
- **আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস:** ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ১১ অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' ঘোষণা করে। এটি মূলত ফোরামেরই একটি অন্যতম অর্জন। কারণ কন্যাশিশুদের জন্য আলাদাভাবে একটি দিবস ঘোষণার জন্য জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামই সর্বপ্রথম এবং দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডভোকেসি-সহ

বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১তে একটি আলাদা ধারা সংযোজনঃ** ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১'-এর দ্বিতীয় ভাগে প্রথমবারের মত কন্যাশিশুর উন্নয়ন (ধারা ১৮) নামে একটি আলাদা ধারা সংযুক্ত করা হয়।

- **জাতীয় শিশুনীতি ২০১১'র মূলনীতিতে ধারা সংযোজনঃ** জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে এ নীতির মূলনীতিতে 'কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ' সংযোজন করা হয়।

- **বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩০ঃ** জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি-তে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা।

- **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং বিধিমালা ২০১৮ঃ** বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ফোরামের বেশকিছু সুপারিশ উক্ত আইন ও বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যঃ** প্রস্তাবিত শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটিতে সদস্য হিসেবে ফোরাম কাজ করছে।

- **মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যঃ** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যঃ** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা গঠিত শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটির সদস্য হিসেবে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম অন্তর্ভুক্ত।

- **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটরি সদস্যঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিসিএ কার্যালয়ের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম কাজ করেছে।

- **যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের খসড়া প্রণয়নঃ** সর্বস্তরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রস্তাবিত 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন' নামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইন পানের লক্ষ্যে পার্লামেন্টরি ককাস অন চাইল্ড রাইটস কমিটির সঙ্গে এবং একইঙ্গে সাবেক ডেপুটি স্পিকারের পরামর্শ অনুযায়ী পার্লামেন্টরি লেজিসলেটিভ

ডিভিশনের সঙ্গে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম অ্যাডভোকেসি কাজ করেছে। ২০২৪ সালে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই খসড়া আইনটিকে পূর্ণাঙ্গ আইন হিসেবে পাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফোরাম এই উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে।

- **বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সদস্য:** স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে 'গার্লস নট ব্রাইড অ্যালায়েন্স' ও 'চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ'-এর সদস্য হিসেবে ফোরাম কাজ করছে।

সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সাংগঠনিক কাঠামো দ্বি স্তর বিশিষ্ট:

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ।

সকল সাধারণ সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণে কেবলমাত্র সেই সকল সংগঠন বা ব্যক্তি আবেদন করতে পারবে যারা নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ফোরাম-এর বিধিমালা মোতাবেক নির্বাচনে একটি করে ভোট দিতে পারেন।

প্রতি দু বছর পর সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে ফোরাম-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনিবাহী পরিষদ মূলত সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ফোরামে তিন ধরনের সদস্য রয়েছে যেমন, সাধারণ পরিষদের সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং দাতা সদস্য। সকল সদস্যই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ফোরাম-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা কাঠামো চ্যাপ্টার কমিটি নামে পরিচিত। নির্বাহী কমিটির সহযোগিতা ও পরামর্শ সাপেক্ষে চ্যাপ্টার কমিটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই চ্যাপ্টার কমিটিসমূহ গড়ে ওঠে। বর্তমানে জেলা পর্যায়ে ২২টি; উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬৯টি চ্যাপ্টার কমিটি গড়ে ওঠেছে।

প্রয়োজন আপনার সম্পৃক্ততা এবং নেতৃত্ব:

চলমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কেবল নারী বা কন্যাশিশুর বিকাশের সুযোগই শুধু রুদ্ধ হয়ে পড়ছে না, এর পরিণতি ভোগ করছে সকল মানুষ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে। জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কন্যাশিশুর জন্য

সম-সুযোগ ও সম-বিকাশের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আপনার ও আপনার সংগঠনের সম্পৃক্ততা জরুরি। আপনার অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও নিবেদিত প্রচেষ্টাই কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে কন্যাশিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি এবং তাদের জন্য একটি সহিংসতামুক্ত ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ফোরাম-এর অর্থায়নঃ

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং ফোরাম-এর ব্যক্তিগত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কন্যাশিশুদের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এ ফোরামে বিনিয়োগ করে থাকেন। যার প্রতিদান হিসেবে তাঁরা দেখতে চান যথাযথ মর্যাদা, অধিকার এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে কন্যাশিশুরা চলাচল করছে এবং তাদের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। যেটি মূলত ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম একটি পদক্ষেপ।

আপনি যে প্রক্রিয়ায় ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হতে পারেনঃ

আপনি ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। ফোরাম-এর সদস্যভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে সদস্য ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফর্মটি ফোরাম-এর সচিবালয় বা ফোরাম-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আবেদন ফর্মটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সদস্যপদ অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ফোরাম কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই আপনাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেভেল: ফোর), ব্লক: এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসকল প্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	অপরাজেয় বাংলাদেশ
২.	একশনএইড বাংলাদেশ
৩.	ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৪.	কারিতাস বাংলাদেশ
৫.	উদ্দীপন
৬.	গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৭.	ঢাকা আহছানিয়া মিশন
৮.	নারীমৈত্রী
৯.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১০.	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ
১১.	অ্যাডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো
১২.	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন
১৩.	এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
১৪.	ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
১৫.	কেয়ার বাংলাদেশ
১৬.	ব্র্যাক
১৭.	সঞ্চয়িতা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৮.	মানবী
১৯.	ভ্রাতৃসংঘ
২০.	মা-শিশু সোসাইটি
২১.	এ্যলায়েন্স ফর কোঅপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব)
২২.	ফ্রয়েবল অ্যাডুকেশন অ্যান্ড স্কুল সোসাইটি
২৩.	ভয়েস অব ডেস্টিটিউট
২৪.	বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেইঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বিস্ক্যান)
২৫.	অর্ণব হেলথ অ্যাডুকেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৬.	ফর ইউ ফর এভার (ফাইফে)

২৭.	রাইটস অ্যান্ড সাইট ফর চিল্ড্রেন (আরএসসি)
২৮.	মায়ের ডাক
২৯.	গোর্কি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩০.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩১.	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ সোসাইটি
৩২.	তরুণ ঐক্যজোট
৩৩.	ডেপ (ডেভেলপমেন্ট অ্যাডুকেশন অ্যান্ড পিস)
৩৪.	জেস ফাউন্ডেশন
৩৫.	অ্যাসোসিয়েশন টু এসিস্ট দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড (এ্যাসাপ)
৩৬.	শাহিনুর ফাউন্ডেশন
৩৭.	সেফ জেনারেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৩৮.	ন্যায়ের আলো সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ
৩৯.	সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৪০.	সফর আলী ভূইয়া সংস্থা
৪১.	ভাটিয়ালি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
৪২.	অপরাজিতা নারী সংগঠন
৪৩.	চিলড্রেন অ্যান্ড আর্থ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৪৪.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর রুরাল ম্যাস
৪৫.	জননী সেবা সংস্থা
৪৬.	উদয়ন-বাংলাদেশ
৪৭.	আড়াই হাজার জন সংঘ (আজস)
৪৮.	সেবা মানিকগঞ্জ
৪৯.	সংযোগ
৫০.	সেবা
৫১.	সেন্টার ফর রুরাল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআরসিডি)
৫২.	নোয়াইল নারী কল্যাণ সমিতি
৫৩.	প্রভাটি এলিভিয়েশন ফর ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ
৫৪.	ইয়ুথ এক্সিলেন্ট সোসাইটি-ইয়েস ব্যাংলাদেশ
৫৫.	দেওভোগ সমাজ উন্নয়ন সংসদ
৫৬.	সহিদ সেবা সংস্থা (এসএসএস)
৫৭.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)

৫৮.	ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজ পিপল (ডিডিপি)
৫৯.	সবুজ বাংলা উন্নয়ন সংস্থা (এসবিইউএস)
৬০.	তাজপুর নারী কল্যাণ সমিতি
৬১.	বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও হস্তশিল্প ফাউন্ডেশন
৬২.	সুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৬৩.	হাতকোপা মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৪.	বেলাভূমি কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বেলাভূমি)
৬৫.	বড়কুপট গণচেতনা ফাউন্ডেশন
৬৬.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকোনমি
৬৭.	দোয়েল সংস্থা
৬৮.	ভুইগড় মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৯.	মৈত্রী মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৭০.	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
৭১.	বন্ধন সমাজ উনয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)
৭২.	এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
৭৩.	ভয়েস অব সাউথ বাংলাদেশ
৭৪.	রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৭৫.	দলিত
৭৬.	নো স্মোকিং ক্লাব
৭৭.	সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৭৮.	শাপলা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
৭৯.	হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (হেপি)
৮০.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)
৮১.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড ভিলেজ ইকোনকি (সেভ)
৮২.	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৮৩.	দি প্রিপ ট্রাস্ট
৮৪.	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
৮৫.	প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৮৬.	ব্রতী
৮৭.	কৈননীয়া
৮৮.	হীড বাংলাদেশ
৮৯.	সিসিডিবি

৯০.	অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)
৯১.	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৯২.	রুম টু রিড বাংলাদেশ
৯৩.	টিএমএসএস
৯৪.	ভূইয়া ফাউন্ডেশন
৯৫.	সোসাইটি ফর নলেজ প্রমোশন অ্যান্ড রিসার্চ (এসকেপিআর)
৯৬.	স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৯৭.	ডনফোরাম
৯৮.	অপূর্ব মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.
৯৯.	আনন্দধারা বহুমুখী সমবায় সমিতি
১০০.	আমাদের প্রচেষ্টা
১০১.	ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
১০২.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি
১০৩.	চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
১০৪.	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
১০৫.	সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিল্ডেন স্ট্যাডিজ
১০৬.	স্যাপ-বাংলাদেশ
১০৭.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ সেন্টার (বিডিপিসি)
১০৮.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি
১০৯.	অ্যাকশন ইন সোস্যাল ডেভলপমেন্ট
১১০.	আস্থা (আত্ম উন্নয়ন ও কল্যাণ সংস্থা)
১১১.	ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১১২.	কোডার
১১৩.	নেবুলা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১১৪.	অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এআইডিএফ)
১১৫.	বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (বিডাব্লিউএইচসি)
১১৬.	চ্যারিটি ফাউন্ডেশন
১১৭.	সোসাইটি ফর আপগ্রেডিং রুরাল অ্যান্ড আরবান ইকোনমি (সিউর)
১১৮.	মায়ের হাসি
১১৯.	উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (ইউপিএস)
১২০.	সোপান

১২১.	নাগরিক উদ্যোগ
১২২.	বিজয় ব্লাড ডোনেশন ক্লাব
১২৩.	নারী জাগরণ বহুমুখী সংস্থা
১২৪.	মীরপাড়া সমবায় সমিতি
১২৫.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকনোমি (সেফ)
১২৬.	চেতনা মহিলা সংস্থা
১২৭.	অ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো)
১২৮.	দুঃস্থ বেকার কল্যাণ সমিতি
১২৯.	মহিলা উন্নয়ন সমিতি (মউস)
১৩০.	গোদনাইল সংস্থা
১৩১.	অর্গানাইজেশন অব এনভারমেন্টাল পলুশন প্রিভেনশন প্রোগাম (ওয়েপ)
১৩২.	কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি
১৩৩.	পুর্বাশার আলো সমাজকল্যাণ সমিতি
১৩৪.	কল্যাণী সেবা প্রতিষ্ঠান
১৩৫.	স্পন্দন উন্নয়ন সংস্থা
১৩৬.	সাফ সংস্থা
১৩৭.	মুক্তাঙ্গন সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৩৮.	একতা দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সমিতি
১৩৯.	সপুরা দুঃস্থ মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি (এসডিএমএকেএস)
১৪০.	লাইফ সেন্টার (লোকাল ইনিশিয়েটিভ ফর এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার)
১৪১.	মুষ্টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৪২.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
১৪৩.	নবজাগরণ সংস্থা (এনজেএস)
১৪৪.	টাগেট পিপলস ফর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (টিপিডিএ)
১৪৫.	বাংলাদেশ পল্লী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (ব্রীডস)
১৪৬.	দি রিজিওন্যাল রিপোর্টিং সোসাইটি
১৪৭.	রোজ সমাজকল্যাণ সংস্থা
১৪৮.	টিপরদী বহুমুখী গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.

১৪৯.	উদ্দীপক
১৫০.	সুখের নীড় বাংলাদেশ
১৫১.	বন্ধন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বিএসডিপি)
১৫২.	যুব সমাজের আলো
১৫৩.	বেকার কল্যাণ সংস্থা (বেকস)
১৫৪.	আপন ফাউন্ডেশন
১৫৫.	দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা (দুকস)
১৫৬.	দেওভোগ সংঘ
১৫৭.	অগ্রগামী যুব সমাজ
১৫৮.	আশার আলো বাংলাদেশ
১৫৯.	আইলপাড়া জনকল্যাণ সমিতি
১৬০.	সাবজেক্ট হেলথ অ্যান্ড অ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন (সেফ)
১৬১.	নেটিভ ইভানজেলিকাল ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্ট
১৬২.	মৌচাক মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৬৩.	হেল্প ফাউন্ডেশন
১৬৪.	ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
১৬৫.	দুঃস্থ নারী ও কন্যার শাহারা সেন্টার
১৬৬.	লফস রাজশাহী
১৬৭.	ব্যাপ্টিস্ট এইড বিবিসিএফ
১৬৮.	প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
১৬৯	পল্লী একতা উন্নয়ন সংস্থা (রুডো)
১৭০	এইড অর্গানাইজেশন
১৭১	লোকাল আইডিয়া ফর এমপাওয়ারমেন্ট (লাইফ)
১৭২	সেভ দ্য চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশ
১৭৩	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিআরডিএস)
১৭৪	ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
১৭৫	সুরভী

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৩-২০২৬

ক্রম	নাম	পদবি	সংগঠনের নাম
১.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সভাপতি	কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২.	জনাব শাহীন আক্তার ডলি	সহ-সভাপতি	নির্বাহী পরিচালক, নারীমৈত্রী
৩.	পক্ষে: ড. বদিউল আলম মজুমদার (বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পর্যন্ত)	সম্পাদক	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
৪	জনাব ওয়াহিদা বানু	সহ-সম্পাদক	নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
৫	জনাব পূরবী তালুকদার	কোষাধ্যক্ষ	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ
৬	জনাব মনোয়ারা বেগম	সদস্য	সভাপতি, একতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭	জনাব আমরীন আফরোজ	সদস্য	পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৮	জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য	সভাপতি, কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৯	জনাব স.ম. মেহেদি হাসান	সদস্য	পরিচালক, লাইফ সেন্টার
১০	জনাব খোন্দকার সহিদুল আলম	সদস্য	পরিচালক, হেল্প ফাউন্ডেশন
১১	অ্যাডভোকেট নিঘাত সীমা	সদস্য	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসকল ব্যক্তি যুক্ত আছেন

ক্রম	ব্যক্তির নাম
১.	অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী
২.	অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন
৩.	আলহাজ্ব উম্মে হাবিবা, প্রধান শিক্ষক, সফুর আলী ভুঞা উচ্চ বিদ্যালয়
৪.	অ্যাডভোকেট সেলিম খান, ব্যবস্থাপক, আর কে গ্রুপ
৫.	আলহাজ্ব প্রিন্সিপাল আবুল বাশার (সমাজকর্মী)
৬.	জনাব জাহিদুল হক খান (উন্নয়নকর্মী)
৭.	জনাব লায়লা নাহার চৌধুরী (সমাজকর্মী)
৮.	জনাব ইয়াসমিন আরা বেবী (উন্নয়নকর্মী)
৯.	জনাব তাজিমা হোসেন মজুমদার (সংগঠক ও নারী উদ্যোক্তা)
১০.	জনাব ফেরদৌসি আক্তার (সমাজকর্মী)
১১.	জনাব ওয়াহিদা বানু স্বপ্না, নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
১২.	জনাব জোছনা খাতুন, সাবেক কাউন্সিলর, সিটি করপোরেশন
১৩.	ড. আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা
১৪.	অধ্যাপক ইফফাত আরা নার্গিস, প্রাক্তন মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
১৫.	ড. মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, গণস্বারক্ষতা অভিযান
১৬.	ড. রওশন জাহান
১৭.	ডা. আসমা খাতুন
১৮.	জনাব শফুরা বেগম (নারী উদ্যোক্তা)
১৯.	জনাব সৈয়দা আহসানা জামান (এ্যানী) (উন্নয়নকর্মী)
২০.	জনাব লায়লা সাজিদ (সমাজকর্মী)
২১.	জনাব জাহানারা রহমান মনি (সমাজকর্মী)
২২.	জনাব নীলুফার বেগম (উন্নয়নকর্মী)
২৩.	জনাব রেহেনা খাতুন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
২৪.	জনাব বিলকিস নাহার (নারী উদ্যোক্তা)
২৫.	জনাব মোস্তফা রহমান (উন্নয়নকর্মী)
২৬.	জনাব মনিরুজ্জামান সরকার (সমাজকর্মী)
২৭.	জনাব শাহিনা আক্তার (উন্নয়নকর্মী)
২৮.	জনাব শামীমা মুক্তা (উন্নয়নকর্মী)
২৯.	জনাব আমিনুল ইসলাম সুজন (লেখক ও সমাজকর্মী)

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি

জেলা কমিটি

বাগেরহাট জেলা কমিটি, বাগেরহাট	জয়পুরহাট জেলা কমিটি, জয়পুরহাট
বরিশাল জেলা কমিটি, বরিশাল	কুড়িগ্রাম জেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটি, চুয়াডাঙ্গা	লালমনিরহাট জেলা কমিটি, লালমনিরহাট
ঝিনাইদহ জেলা কমিটি, ঝিনাইদহ	নাটোর জেলা কমিটি, নাটোর
খুলনা জেলা কমিটি, খুলনা	পাবনা জেলা কমিটি, পাবনা
কুষ্টিয়া জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	রাজশাহী জেলা কমিটি, রাজশাহী
মাগুরা জেলা কমিটি, মাগুরা	মাদারীপুর জেলা কমিটি, মাদারীপুর
নওগাঁ জেলা কমিটি, নঁওগা	ঝালকাঠী জেলা কমিটি, ঝালকাঠি
নড়াইল জেলা কমিটি, নড়াইল	মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর
কক্সবাজার জেলা কমিটি, কক্সবাজার	ফরিদপুর জেলা কমিটি, ফরিদপুর
সাতক্ষীরা জেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	কুমিল্লা জেলা কমিটি, কুমিল্লা
কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ জেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল জেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	নেত্রকোণা জেলা কমিটি, নেত্রকোনা
রংপুর জেলা কমিটি, রংপুর	যশোর জেলা কমিটি, যশোর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ
গাজীপুর জেলা কমিটি, গাজীপুর	খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি, চট্টগ্রাম

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি

উপজেলা কমিটি

বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটি, বরিশাল	কেন্দুয়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা	দুর্গাপুর উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
শ্যামনগর উপজেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	মির্জাপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
অভয়নগর উপজেলা কমিটি, যশোর	মধুপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
গুরুদাসপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	নাগরপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
বটিয়াঘাটা উপজেলা কমিটি, খুলনা	নান্দাইল উপজেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
কাঠালিয়া উপজেলা কমিটি, ঝালকাঠি	চারঘাট উপজেলা কমিটি, রাজশাহী
পাঁচবিবি উপজেলা কমিটি, জয়পুরহাট	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
কটিয়াদী উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	কলমাকান্দা উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
নাগেশ্বরী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম	রৌমারী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
গোপালপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	আটপাড়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
সিংগাইর উপজেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া
খোকসা উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	শরীয়তপুর সদর উপজেলা কমিটি, শরীয়তপুর
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লাকসাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা
মাদারীপুর সদর উপজেলা কমিটি, বরিশাল	মণিরামপুর উপজেলা কমিটি, যশোর
লক্ষ্মীগঞ্জ উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা	করিমগঞ্জ উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ
মোহনপুর উপজেলা কমিটি, রাজশাহী	জাহাঙ্গীরপুর উপজেলা কমিটি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
বদরগঞ্জ উপজেলা কমিটি, রংপুর	ঘাটাইল উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লামা উপজেলা কমিটি, বান্দরবান
কালিহাতী উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	উল্লাপাড়া উপজেলা কমিটি, সিরাজগঞ্জ
খুবজীপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	মনিরামপুর উপজেলা কমিটি
গাংনী উপজেলা কমিটি, মেহেরপুর	ডুমুরিয়া উপজেলা কমিটি
পাংশা উপজেলা কমিটি	কালুখালি উপজেলা কমিটি

ইউনিয়ন কমিটি

মাধবপাশা ইউনিয়ন কমিটি
চাঁদপাশা ইউনিয়ন কমিটি
বাকাল ইউনিয়ন কমিটি
কেওড়া ইউনিয়ন কমিটি
উত্তরদা ইউনিয়ন কমিটি
মৈশাতুয়া ইউনিয়ন কমিটি
আদ্রা ইউনিয়ন কমিটি
ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জাফরাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
কাদিরজঙ্গল ইউনিয়ন কমিটি
ঘটমাঝি ইউনিয়ন কমিটি
দীঘি ইউনিয়ন কমিটি
পঞ্চসার ইউনিয়ন কমিটি
চর নিলক্ষীয়া ইউনিয়ন কমিটি
চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
কুষ্টিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ভাবখালি ইউনিয়ন কমিটি
জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংহের বাংলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
নিকরাইল ইউনিয়ন কমিটি
ঝাওয়াইল ইউনিয়ন কমিটি
দামিহা ইউনিয়ন কমিটি
বেতাগা ইউনিয়ন কমিটি
ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
রহমতপুর ইউনিয়ন কমিটি
দেহেরগাতি ইউনিয়ন কমিটি
রাজিহার ইউনিয়ন কমিটি
কীর্তিপাশা ইউনিয়ন কমিটি
আজগড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঝলম উত্তর ইউনিয়ন কমিটি
হেসাখাল ইউনিয়ন কমিটি
কোনাখালী ইউনিয়ন কমিটি
গুজাদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
দেহুন্দা ইউনিয়ন কমিটি
পিয়ারপুর ইউনিয়ন কমিটি
গড়পাড়া ইউনিয়ন কমিটি
রামপাল ইউনিয়ন কমিটি
খাগডহর ইউনিয়ন কমিটি
বয়ড়া ইউনিয়ন কমিটি
দাপুনিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোগা ইউনিয়ন কমিটি
চল্লিশা ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
ফলদা ইউনিয়ন কমিটি
অলোয়া ইউনিয়ন কমিটি
হেমনগর ইউনিয়ন কমিটি
দিগদাইড় ইউনিয়ন কমিটি
শুভদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মনোহরপুর ইউনিয়ন কমিটি

দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি
বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন কমিটি
বড়খাদা ইউনিয়ন কমিটি
মটমুড়া ইউনিয়ন কমিটি
তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
সাহারবাটি ইউনিয়ন কমিটি
ধানখোলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
সাহস ইউনিয়ন কমিটি
শোভনা ইউনিয়ন কমিটি
রুদাঘরা ইউনিয়ন কমিটি
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন কমিটি
মিঠাখালী ইউনিয়ন কমিটি
রায়েন্দা ইউনিয়ন কমিটি
ফকিরহাট ইউনিয়ন কমিটি
খুবজীপুর ইউনিয়ন কমিটি
পত্নীতলা ইউনিয়ন কমিটি
দিবর ইউনিয়ন কমিটি
মাটিন্দর ইউনিয়ন কমিটি
পাটিচড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোষনগর ইউনিয়ন কমিটি
শিহাড়া ইউনিয়ন কমিটি
দুলাই ইউনিয়ন কমিটি
মৌগাছি ইউনিয়ন কমিটি
জাহানাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
সরদহ ইউনিয়ন কমিটি
খালিশাচাপানী ইউনিয়ন কমিটি
জলমা ইউনিয়ন কমিটি
বাট্টাইল ইউনিয়ন কমিটি
ষোলটাকা ইউনিয়ন কমিটি
বামুন্দী ইউনিয়ন কমিটি
কাজিপুর ইউনিয়ন কমিটি
কাথুলী ইউনিয়ন কমিটি
রায়পুর ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
খর্ণিয়া ইউনিয়ন কমিটি
রঘুনাথপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন কমিটি
মৌতলা ইউনিয়ন কমিটি
বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি
সাউথখালি ইউনিয়ন কমিটি
বাহিরদিয়া মনসা ইউনিয়ন কমিটি
ধারাবারিষা ইউনিয়ন কমিটি
নিরমইল ইউনিয়ন কমিটি
আকবরপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন কমিটি
নজিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
আমাইড় ইউনিয়ন কমিটি
মহাদেবপুর ইউনিয়ন কমিটি
সাগরকান্দি ইউনিয়ন কমিটি
ধুরইল ইউনিয়ন কমিটি
বাকশিমইল ইউনিয়ন কমিটি
ভায়ালক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন কমিটি
নোহালী ইউনিয়ন কমিটি

কোলকোন্দা ইউনিয়ন কমিটি
বেতগাড়ি ইউনিয়ন কমিটি
চতরা ইউনিয়ন কমিটি
মিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
বাহুবল ইউনিয়ন কমিটি
গোপায়া ইউনিয়ন কমিটি
লস্করপুর ইউনিয়ন কমিটি
নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন কমিটি
পুটিজুরী ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়ন কমিটি
পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন কমিটি
পাথারিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
ডুমুরিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জামালগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটি

লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন কমিটি
গজঘণ্টা ইউনিয়ন কমিটি
কাবিলপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংচাপৈর ইউনিয়ন কমিটি
সাতকাপন ইউনিয়ন কমিটি
নিজামপুর ইউনিয়ন কমিটি
পৈল ইউনিয়ন কমিটি
গংগাচড়া ইউনিয়ন কমিটি
আলমবিদিতর ইউনিয়ন কমিটি
চরমহল্লা ইউনিয়ন কমিটি
দরগাপাশা ইউনিয়ন কমিটি
ফেনারবাগ ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরঘোনা ইউনিয়ন কমিটি
আটলিয়া ইউনিয়ন কমিটি

শোক বার্তা

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি ৯ জুন ২০২৪, ঢাকায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব নাছিমা আক্তার জলি ছিলেন একজন নিবেদিত সমাজ উন্নয়নকর্মী। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর পরিচালক (কর্মসূচি) হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানকালীন থেকে দেশের ২০৬টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্ল্যাটফর্ম 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' এবং তৃণমূলের নারীনেত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি, দক্ষতার সঙ্গে সংগঠন পরিচালনা ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন।

আমরা মনে করি, নাছিমা আক্তার জলি'র মৃত্যুতে জাতি একজন নিবেদিতপ্রাণ ও বলিষ্ঠ উন্নয়নকর্মী ও নারী ও কন্যাশিশুদের স্বার্থে নিবেদিত একজন অভিভাবককে হারালো।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে, পুত্রবধূ, স্বামী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আমরা জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর পক্ষ থেকে জনাব নাছিমা আক্তার জলির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম।